চারিত্রপূজা।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মূল্য ||০ আনা।

কলিকাতা, মজুমদার লাইব্রেরি,
২০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট দিনময়ী প্রেসে
শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

সূচী।

চারিত্রপূজা।

স্বীকার করিতেই হইবে, মৃত মান্যব্যক্তির জন্য পাথরের মূর্ত্তি গড়া আমাদের দেশে চলিত ছিল না; এইপ্রকার মার্ব্বলপাথরের পিণ্ডদান-প্রথা আমাদের কাছে অভ্যস্ত নহে। আমরা হাহাকার করিয়াছি, অশ্রুপাত করিয়াছি, বলিয়াছি, 'আহা, দেশের এত-বড় লোকটাও গেল' —কিন্তু কমিটির উপর স্মৃতিরক্ষার ভার দিই নাই।

এখন আমরা শিখিয়াছি এইরূপই কর্ত্তব্য, অথচ তাহা আমাদের সংস্কারগত হয় নাই, এইজন্য কর্ত্তব্য পালিত না হইলে মুখে লজ্জা দিই, কিন্তু হৃদয়ে আঘাত পাই না।

ভিন্ন মানুষের হৃদয়ের বৃত্তি একরকম হইলেও বাহিরে তাহার প্রকাশ নানাকারণে নানারকম হইয়া থাকে। ইংরাজ প্রিয়ব্যক্তির মৃতদেহ মাটির মধ্যে ঢাকিয়া পাথরে চাপা দিয়া রাখে, তাহাতে নামধাম-তারিখ খুদিয়া রাখিয়া দেয় এবং তাহার চারিদিকে ফুলের গাছ করে। আমরা পরমাত্মীয়ের মৃতদেহ শ্মশানে ভস্ম করিয়া চলিয়া আসি। কিন্তু প্রিয়-জনের প্রিয়ত্ব কি আমাদের কাছে কিছুমাত্র অল্প? ভালবাসিতে এবং শোক করিতে আমরা জানি না, ইংরাজ জানে, এ কথা কবর এবং শ্মশানের সাক্ষ্য লইয়া ঘোষণা করিলেও, হৃদয় তাহাতে সায় দিতে পারে না।

ইহার অনুরূপ তর্ক এই যে, "থ্যাঙ্ক্ য়ু"র প্রতিবাক্য আমরা বাংলায় ব্যবহার করি না, অতএব আমরা অকৃতজ্ঞ।

"থ্যাঙ্ক্ য়ু" শব্দের দ্বারা হাতে-হাতে কৃতজ্ঞতা ঝাড়িয়া ফেলিবার একটা চেষ্টা আছে, সেটা আমরা জবাবস্বরূপ বলিতে পারি। য়ুরোপ কাহারো কাছে বাধ্য থাকিতে চাহে না—সে স্বতন্ত্র। কাহারো কাছে তাহার কোন দাবী নাই, সুতরাং যাহা পায়, তাহা সে গায়ে রাখে না। শুধিয়া তখনি নিষ্কৃতি পাইতে চায়।

পরস্পরের প্রতি আমাদের দাবী আছে, আমাদের সমাজের গঠনই সেইরূপ। আমাদের সমাজে যে ধনী, সে দান করিবে; যে গৃহী, সে আতিথ্য করিবে; যে জ্ঞানী, সে অধ্যাপন করিবে; যে জ্যেষ্ঠ, সে পালন করিবে; যে কনিষ্ঠ, সে সেবা করিবে;—ইহাই বিধান। পরস্পরের দাবীতে আমরা পরস্পর বাধ্য। ইহাই আমরা মঙ্গল বলিয়া জানি। প্রার্থী যদি ফিরিয়া যায়, তবে ধনীর পক্ষেই তাহা অশুভ, অতিথি যদি ফিরিয়া যায়, তবে গৃহীর পক্ষেই তাহা অকল্যাণ। শুভকর্ম্ম কর্ম্মকর্ত্তার পক্ষেই শুভ। এইজন্য নিমন্ত্রণকারীই নিমন্ত্রিতের নিকট কৃতজ্ঞতা-স্বীকার করেন। আহূতবর্গের সন্তোষে যে একটি মঙ্গলজ্যোতি গৃহ পরিব্যাপ্ত করিয়া উদ্ভাসিত হয়, তাহা নিমন্ত্রণকারীর পক্ষেই পুরস্কার। আমাদের দেশে নিমন্ত্রণের প্রধানতম ফল নিমন্ত্রিত পায় না, নিমন্ত্রণ-কারীই পায়—তাহা, মঙ্গলকর্ম্ম সুসম্পন্ন করিবার আনন্দ, তাহা রসনা-তৃপ্তির অপেক্ষা অধিক।

এই মঙ্গল যদি আমাদের সমাজের মুখ্য অবলম্বন না হইত, তবে সমাজের প্রকৃতি এবং কর্ম্ম অন্যরকমের হইত। স্বার্থ এবং স্বাতন্ত্র্যকে যে বড় করিয়া দেখে, পরের জন্য কাজ করিতে তাহার সর্ব্বদা উত্তেজনা আবশ্যক করে। সে যাহা দেয়, অন্তত তাহার একটা রসিদ লিখিয়া রাখিতে চায়। তাহার যে ক্ষমতা আছে, সেই ক্ষমতার দ্বারা অন্যের

উপরে সে যদি প্রভাববিস্তার করিতে না পারে, তবে ক্ষমতাপ্রয়োগ করিবার যথেষ্ট উৎসাহ তাহার না থাকিবার কথা। এইজন্য স্বাতন্ত্র্য-প্রধান সমাজকে ক্ষমতাশালী লোকের কাছ হইতে কাজ আদায় করিবার জন্য সর্ব্বদা বাহবা দিতে হয়; যে দান করে, তাহার যেমন সমারোহ, যে গ্রহণ করে, তাহারও তেম্‌নি অনেক আয়োজনের দরকার হয়। প্রত্যেক সমাজ নিজের বিশেষ প্রকৃতি এবং বিশেষ আবশ্যক অনুসারে নিজের নিয়মে নিজের কাজ-উদ্ধারে প্রবৃত্ত হয়। দাতা দান করিয়াই কৃতার্থ, এই ভাবটার উপরেই আমরা অত্যন্ত ঝোঁক দিয়া থাকি; আর গ্রহীতা গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ, এই ভাবটার উপরেই য়ুরোপ অধিক ঝোঁক দিয়া থাকে। স্বার্থের দিক্ দিয়া দেখিলে যে গ্রহণ করে, তাহারই গরজ বেশি, মঙ্গলের দিক্ দিয়া দেখিলে যে দান করে, তাহারই গরজ বেশি। অতএব আদর্শভেদে ভিন্ন সমাজ ভিন্ন পথ দিয়া নিজের কাজে যাত্রা করে।

কিন্তু স্বার্থের উত্তেজনা মানবপ্রকৃতিতে মঙ্গলের উত্তেজনা অপেক্ষা সহজ এবং প্রবল, তাহাতে সন্দেহ নাই। অর্থনীতিশাস্ত্রে বলে, ডিমাণ্ড অনুসারে সাপ্লাই অর্থাৎ চাহিদা অনুসারে জোগান্ হইয়া থাকে। খরিদ-দারের তরফে যেখানে অধিক মূল্য হাঁকে, ব্যবসাদারের তরফ হইতে সেইখানেই অধিক মাল আসিয়া পড়ে। যে সমাজে ক্ষমতার মূল্য বেশি, সেই সমাজেই ক্ষমতাশালীর চেষ্টা বেশি হইয়া থাকে, ইহাই সহজ স্বভাবের নিয়ম।

কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষ বরাবর সহজ স্বভাবের নিয়মের উপর জয়ী হইবার চেষ্টা করিয়াছে। অর্থনীতিশাস্ত্র আর সব জায়গা-তেই খাটে, কেবল ভারতবর্ষেই তাহা উলট্‌পালট্ হইয়া যায়। ছোট-বড় সকল বিষয়েই ভারতবর্ষ মানবস্বভাবকে সহজ স্বভাবের উর্দ্ধে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে। ক্ষুধাতৃষ্ণা হইতে আরম্ভ করিয়া ধনমান-সম্ভোগ পর্য্যন্ত কোন বিষয়েই তাহার চালচলন সহজরকম নহে। আর

কিছু না পায় ত অন্তত তিথিনক্ষত্রের দোহাই দিয়া সে আমাদের অত্যন্ত স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলাকে পদে-পদে প্রতিহত করিয়া রাখে। এই দুঃসাধ্য কার্য্যে সে অনেকসময় মূঢ়তাকে সহায় করিয়া অবশেষে সেই মূঢ়তার দ্বারা নিজের সর্ব্বনাশসাধন করিয়াছে। ইহা হইতে, তাহার চেষ্টার একান্ত লক্ষ্য কোন্ দিকে, অন্তত তাহা বুঝা যায়।

দুর্ভাগ্যক্রমে মানুষের দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ। এইজন্য তাহার প্রবল চেষ্টা এমন-সকল উপায় অবলম্বন করে, যাহাতে শেষকালে সেই উপায়ের দ্বারাতেই সে মারা পড়ে। সমস্ত সমাজকে নিষ্কাম মঙ্গলকর্ম্মে দীক্ষিত করিবার প্রবল আবেগে ভারতবর্ষ অন্ধতাকেও শ্রেয়োজ্ঞান করিয়াছে; এ কথা ভুলিয়া গেছে যে, বরঞ্চ স্বার্থের কাজ অন্ধভাবে চলিতে পারে, কিন্তু মঙ্গলের কাজ তাহা পারে না। সজ্ঞান ইচ্ছার উপরেই মঙ্গলের মঙ্গলত্ব প্রতিষ্ঠিত। কলেই হউক, আর বলেই হউক, উপযুক্ত কাজটি করাইয়া লইতে পারিলেই স্বার্থসাধন হয়, কিন্তু সম্পূর্ণ বিবেকের সঙ্গে কাজ না করিলে কেবল কাজের দ্বারা মঙ্গলসাধন হইতে পারে না। তিথিনক্ষত্রের বিভীষিকা এবং জন্মজন্মান্তরের সদ্গতির লোভদ্বারা মঙ্গলকাজ করাইবার চেষ্টা করিলে, কেবল কাজই করান হয়, মঙ্গল করান হয় না। কারণ, মঙ্গল স্বার্থের ন্যায় অন্য লক্ষ্যের অপেক্ষা করে না, মঙ্গলেই মঙ্গলের পূর্ণতা।

কিন্তু বৃহৎ জনসমাজকে এক আদর্শে বাঁধিবার সময় মানুষের ধৈর্য্য থাকে না। তখন ফললাভের প্রতি তাহার আগ্রহ ক্রমে যতই বাড়িতে থাকে, ততই উপায়সম্বন্ধে তাহার আর বিচার থাকে না। রাষ্ট্রহিতৈষা যে-সকল দেশের উচ্চতম আদর্শ, সেখানেও এই অন্ধতা দেখিতে পাওয়া যায়। রাষ্ট্রহিতৈষার চেষ্টাবেগ যতই বাড়িতে থাকে, ততই সত্যমিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়ের বুদ্ধি তিরোহিত হইতে থাকে। ইতিহাসকে অলীক করিয়া, প্রতিজ্ঞাকে লঙ্ঘন করিয়া, ভদ্রনীতিকে উপেক্ষা করিয়া, রাষ্ট্র-

মহিমাকে বড় করিবার চেষ্টা হয়,—অন্ধ অহঙ্কারকে প্রতিদিন অভ্রভেদী করিয়া তোলাকেও শ্রেয় বলিয়া বোধ হইতে থাকে—অবশেষে, ধর্ম্ম, যিনি সকলকে ধারণ করিয়া রক্ষা করেন, তাঁহাকে সবলে আঘাত করিয়া নিজের আশ্রয়শাখাটিকেই ছেদন করা হয়। ধর্ম্ম কলের মধ্যেও বিনষ্ট হন, বলের দ্বারাও বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকেন। আমরা আমাদের মঙ্গলকে কলের মধ্যে ধরিয়া রাখিতে গিয়া মারিয়া ফেলিয়াছি, য়ুরোপ স্বার্থোন্নতিকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে গিয়া প্রত্যহই বিনাশ করিতেছে।

অতএব, আমাদের প্রাচীনসমাজ আজ নিজের মঙ্গল হারাইয়াছে, দুর্গতির বিস্তীর্ণ জালের মধ্যে অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে জড়ীভূত হইয়া আছে, ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি বটে; তবু বলিতে হইবে, মঙ্গলকেই লাভ করিবার জন্য ভারতবর্ষের সর্ব্বাঙ্গীণ চেষ্টা ছিল। স্বার্থসাধনের প্রয়াসই যদি স্বভাবের সহজ নিয়ম হয়, তবে সে নিয়মকে ভারতবর্ষ উপেক্ষা করিয়াছিল। সেই নিয়মকে উপেক্ষা করিয়াই যে তাহার দুর্গতি ঘটিয়াছে, তাহা নহে; কারণ, সে নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়াও গুরুতর দুর্গতি ঘটে—কিন্তু সমাজকে সকল দিক্ হইতে মঙ্গলজালে জড়িত করিবার প্রবল চেষ্টায় অন্ধ হইয়া, সে নিজের চেষ্টাকে নিজে ব্যর্থ করিয়াছে। ধৈর্য্যের সহিত যদি জ্ঞানের উপর এই মঙ্গলকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করি, তবে আমাদের সামাজিক আদর্শ সভ্যজগতের সমুদয় আদর্শের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইবে। অর্থাৎ আমাদের পিতামহদের শুভ ইচ্ছাকে যদি কলের দ্বারা সফল করিবার চেষ্টা না করিয়া জ্ঞানের দ্বারা সফল করিবার চেষ্টা করি, তবে ধর্ম্ম আমাদের সহায় হইবেন।'

কিন্তু কল-জিনিষটাকে একেবারে বরখাস্ত করা যায় না। এক এক দেবতার এক এক বাহন আছে—সম্প্রদায়দেবতার বাহন কল। বহুতর লোককে এক আদর্শে গঠিত করিতে গেলে বোধ করি বারো-আনা লোককে অন্ধ অভ্যাসের বশবর্ত্তী করিতে হয়। জগতে যত ধর্ম্মসম্প্রদায়

আছে, তাহাদের মধ্যে সজ্ঞান নিষ্ঠাসম্পন্ন লোক বেশি পাওয়া যায় না। খ্রীষ্টানজাতির মধ্যে আন্তরিক খ্রীষ্টান কত অল্প, তাহা দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা জানিতে পাইয়াছি, এবং হিন্দুদের মধ্যে অন্ধসংস্কারবিমুক্ত যথার্থ জ্ঞানী হিন্দু যে কত বিরল, তাহা আমরা চিরাভ্যাসের জড়তা-বশত ভাল করিয়া জানিতেও পাই না। সকল লোকের প্রকৃতি যখন এক হয় না, তখন একই আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিতে গেলে অনেক বাজে মাল্‌মস্‌লা আসিয়া পড়ে। যে সকল বাছা-বাছা লোক এই আদর্শের অনুসারী, তাঁহারা সাম্প্রদায়িক কলের ভাবটাকে প্রাণের দ্বারা ঢাকিয়া লন। কিন্তু কলটাই যদি বিপুল হইয়া উঠিয়া প্রাণকে পিষিয়া ফেলে, প্রাণকে খেলিবার সুবিধা না দেয়, তবেই বিপদ্‌। সকল দেশেই মাঝেমাঝে মহাপুরুষরা উঠিয়া সামাজিক কলের বিরুদ্ধে সকলকে সচেতন করিতে চেষ্টা করেন—সকলকে সতর্ক করিয়া বলেন, কলের অন্ধ গতিকেই সকলে প্রাণের গতি বলিয়া যেন ভ্রম না করে। অতএব বাহনটিই যখন সমাজদেবতার কাঁধের উপর চড়িয়া বসিবার চেষ্টা করে, যন্ত্র যখন যন্ত্রীকেই নিজের যন্ত্রস্বরূপ করিবার উপক্রম করে, তখন সমাজে ও সমাজের কলে মাঝেমাঝে ঝুটাপুটি বাধিয়া যায়। মানুষ যদি সেই যুদ্ধে কলের উপর জয়ী হয় ত ভাল, আর কল যদি মানুষকে পরাভূত করিয়া চাকার নীচে চাপিয়া রাখে, তবেই সর্ব্বনাশ।

আমাদের সমাজের প্রাচীন কলটা নিজের সচেতন আদর্শকে অন্তরাল করিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া, জড় অনুষ্ঠানে জ্ঞানকে সে আধমরা করিয়া পিঁজরার মধ্যে আবদ্ধ করিয়াছে বলিয়া, আমরা য়ুরোপীয় আদর্শের সহিত নিজেদের আদর্শের তুলনা করিয়া গৌরব অনুভব করিবার অবকাশ পাই না। আমরা কথায়-কথায় লজ্জা পাই। আমাদের সমাজের দুর্ভেদ্য জড়স্তূপ হিন্দুসভ্যতার কীর্ত্তিস্তম্ভ নহে—ইহার অনেকটাই

সুদীর্ঘকালের অযত্নসঞ্চিত ধূলামাত্র। অনেকসময় য়ুরোপীয় সভ্যতার কাছে ধিক্কার পাইয়া আমরা এই ধূলিস্তূপকে লইয়াই গায়ের জোরে গর্ব্ব করি—কালের এই সমস্ত অনাহূত আবর্জ্জনারাশিকেই আমরা আপনার বলিয়া অভিমান করি—ইহার অভ্যন্তরে যেখানে আমাদের যথার্থ গর্ব্বের ধন হিন্দুসভ্যতার প্রাচীন আদর্শ আলোক ও বায়ুর অভাবে মূর্চ্ছান্বিত হইয়া পড়িয়া আছে, সেখানে দৃষ্টিপাত করিবার পথ পাই না।

প্রাচীন ভারতবর্ষ সুখ, স্বার্থ, এমন কি ঐশ্বর্য্যকে পর্য্যন্ত খর্ব্ব করিয়া মঙ্গলকেই যেভাবে সমাজের প্রতিষ্ঠাস্থল করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, এমন আর কোথাও হয় নাই। অন্যদেশে ধনমানের জন্য, প্রভুত্ব-অর্জ্জনের জন্য, হানাহানি-কাড়াকাড়ি করিতে সমাজ প্রত্যেককেই উৎসাহ দিয়া থাকে। ভারতবর্ষ সেই উৎসাহকে সর্ব্বপ্রকারে নিরস্ত করিয়াছে; কারণ স্বার্থোন্নতি তাহার লক্ষ্য ছিল না, মঙ্গলই তাহার লক্ষ্য ছিল। আমরা—ইংরাজের ছাত্র আজ বলিতেছি, এই প্রতিযোগিতা—এই হানাহানির অভাবে আমাদের আজ দুর্গতি হইয়াছে। প্রতিযোগিতার উত্তরোত্তর প্রশ্রয়ে ইংলণ্ড-ফ্রান্স-জর্ম্মণি-রাশিয়া-আমেরিকাকে ক্রমশ কিরূপ উগ্র হিংস্রতার দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, কিরূপ প্রচণ্ড সংঘাতের মুখের কাছে দাঁড় করাইয়াছে, সভ্যনীতিকে প্রতিদিন কিরূপ বিপর্য্যস্ত করিয়া দিতেছে, তাহা দেখিলে প্রতিযোগিতাপ্রধান সভ্যতাকেই চরম সভ্যতা বলিতে কোনোমতেই প্রবৃত্তি হয় না। বলবুদ্ধি ও ঐশ্বর্য্য মনুষ্যত্বের একটা অঙ্গ হইতে পারে, কিন্তু শান্তি, সামঞ্জস্য এবং মঙ্গলও কি তদপেক্ষা উচ্চতর অঙ্গ নহে? তাহার আদর্শ এখন কোথায়? এখনকার কোন্ বণিকের আপিসে, কোন্ রণক্ষেত্রে? কোন্ কালো কোর্ত্তায়, লাল কোর্ত্তায় বা খাকি কোর্ত্তায় সে সজ্জিত হইয়াছে? সে ছিল প্রাচীন ভারতবর্ষের

কুটীরপ্রাঙ্গণে শুভ্র উত্তরীয় পরিয়া। সে ছিল ব্রহ্মপরায়ণ তপস্বীর নিভৃত ধ্যানাসনে, সে ছিল ধর্ম্মপরায়ণ আর্য্য গৃহস্থের কর্ম্মমুখরিত যজ্ঞশালায়।

দল বাঁধিয়া পূজা, কমিটি করিয়া শোক বা চাঁদা করিয়া কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ, এ আমাদের জাতির প্রকৃতিগত নহে, এ কথা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। এ গৌরবের অধিকার আমাদের নাই—কিন্তু তাই বলিয়া আমরা লজ্জা পাইতে প্রস্তুত নহি। সংসারের সর্ব্বত্রই হরণ-পূরণের নিয়ম আছে। আমাদের বাঁ-দিকে কম্‌তি থাকিলেও ডান-দিকে বাড়্‌তি থাকিতে পারে। যে ওড়ে, তাহার ডানা বড়, কিন্তু পা ছোট; যে দৌড়ায়, তাহার পা বড়, কিন্তু ডানা নাই।

আমাদের দেশে আমরা বলিয়া থাকি, মহাত্মাদের নাম প্রাতঃস্মরণীয়। তাহা কৃতজ্ঞতার ঋণ শুধিবার জন্য নহে—ভক্তিভাজনকে দিবসারম্ভে যে ব্যক্তি ভক্তিভাবে স্মরণ করে, তাহার মঙ্গল হয়—মহাপুরুষদের তাহাতে উৎসাহবৃদ্ধি হয় না, যে ভক্তি করে, সে ভাল হয়। ভক্তি-করা প্রত্যেকের প্রাত্যহিক কর্ত্তব্য।

কিন্তু তবে ত একটা লম্বা নামের মালা গাঁথিয়া প্রত্যহ আওড়াইতে হয় এবং সে মালা ক্রমশই বাড়িয়া চলে। তাহা হয় না। যথার্থ ভক্তিই যেখানে উদ্দেশ্য, সেখানে মালা বেশি বাড়িতে পারে না। ভক্তি যদি নির্জ্জীব না হয়, তবে সে জীবনের ধর্ম্ম অনুসারে গ্রহণ-বর্জ্জন করিতে থাকে, কেবলি সঞ্চয় করিতে থাকে না।

আমার প্রকৃতি যে মহাত্মাদিগকে প্রত্যহস্মরণযোগ্য বলিয়া ভক্তি করে, তাঁহাদের নাম যদি উচ্চারণ করি, তবে কতটুকু সময় লয়! প্রত্যেক পাঠক যদি নিজের মনে চিন্তা করিয়া দেখেন, তবে কয়টি নাম তাঁহাদের মুখে আসে? ভক্তি যাঁহাদিগকে হৃদয়ে সজীব করিয়া না

রাখে, বাহিরে তাঁহাদের পাথরের মূর্ত্তি গড়িয়া রাখিলে আমার তাহাতে কি লাভ?

তাঁহাদের তাহাতে লাভ আছে, এমন কথা উঠিতেও পারে। লোকে দল বাঁধিয়া প্রতিমা স্থাপন করিবে, অথবা মৃতদেহ বিশেষ স্থানে সমাহিত হইয়া গৌরব প্রাপ্ত হইবে, এই আশা স্পষ্টত বা অলক্ষ্যে মনকে উৎসাহ দিতেও পারে। কবরের দ্বারা খ্যাতিলাভ করিবার একটা মোহ আছে, তাহা তাজমহল প্রভৃতির ইতিহাস হইতে জানা যায়।

কিন্তু আমাদের সমাজ মহাত্মাদিগকে সেই বেতন দিয়া বিদায় করিতে চাহে নাই। আমাদের সমাজে মাহাত্ম্য সম্পূর্ণ বিনা-বেতনের। ভারতবর্ষে অধ্যাপক, সমাজের নিকট হইতে ব্রাহ্মণের প্রাপ্য দান-দক্ষিণা গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু অধ্যাপনার বেতন শোধ করিয়া দিয়া আমাদের সমাজ তাঁহাদিগকে অপমানিত করে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মঙ্গলকর্ম্ম যিনি করিবেন, তিনি নিজের মঙ্গলের জন্যই করিবেন, ইহাই ভারতবর্ষের আদর্শ। কোনো বাহ্যমূল্য লইতে গেলেই মঙ্গলের মূল্য কমিয়া যায়।

দলের একটা উৎসাহ আছে, তাহা সংক্রামক—তাহা মূঢ়ভাবে পরস্পরের মধ্যে সঞ্চারিত হয়—তাহার অনেকটা অলীক। "গোলে হরিবোল" ব্যাপারে হরিবোল যতটা থাকে, গোলের মাত্রা তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি হইয়া পড়ে। দলের আন্দোলনে অনেকসময় তুচ্ছ উপলক্ষ্যে ভক্তির ঝড় উঠিতে পারে—তাহার সাময়িক প্রবলতা যতই হোক্ না কেন, ঝড়-জিনিষটা কখনই স্থায়ী নহে। সংসারে এমন কতবার কতশত দলের দেবতার অকস্মাৎ সৃষ্টি হইয়াছে এবং জয়ঢাক বাজিতে বাজিতে অতলস্পর্শ বিস্মৃতির মধ্যে তাহাদের বিসর্জ্জন হইয়াছে। পাথরের মূর্ত্তি গড়িয়া জবরদস্তি করিয়া কি কাহাকেও

মনে রাখা যায়? ওয়েষ্ট্‌মিনৃষ্টার অ্যাবিতে কি এমন অনেকের নাম পাথরে খোদা হয় নাই, ইতিহাসে যাহাদের নামের অক্ষর প্রত্যহ ক্ষুদ্র ও ম্লান হইয়া আসিতেছে? এই সকল ক্ষণকালের দেবতাগণকে দলীয় উৎসাহে চিরকালের আসনে বসাইবার চেষ্টা করা, না দেবতার পক্ষে ভাল, না দলের পক্ষে শুভকর। দলগত প্রবল উত্তেজনা যুদ্ধে-বিগ্রহে এবং প্রমোদ-উৎসবে উপযোগী হইতে পারে, কারণ ক্ষণিকতাই তাহার প্রকৃতি—কিন্তু ভক্তির পক্ষে সংযত-সমাহিত শান্তিই শোভন এবং অনুকূল, কারণ তাহা অকৃত্রিমতা এবং ধ্রুবতা চাহে, উন্মত্ততায় তাহা আপনাকে নিঃশেষিত করিতে চাহে না।

য়ুরোপেও আমরা কি দেখিতে পাই? সেখানে দল বাঁধিয়া যে ভক্তি উচ্ছ্বসিত হয়, তাহা কি যথার্থ ভক্তিভাজনের বিচার করে? তাহা কি সাময়িক উপকারকে চিরন্তন উপকারের অপেক্ষা বড় করে না, তাহা কি গ্রাম্যদেবতাকে বিশ্বদেবতার চেয়ে উচ্চে বসায় না? তাহা মুখর দলপতিগণকে যত সম্মান দেয়, নিভৃতবাসী মহাতপস্বীদিগকে কি তেমন সম্মান দিতে পারে? শুনিয়াছি লর্ড্ পামারষ্টনের সমাধিকালে যেরূপ বিরাট্ সম্মানের সমারোহ হইয়াছিল, এমন ক্বচিৎ হইয়া থাকে। দূরে হইতে আমাদের মনে এ কথা উদয় হয় যে, এই ভক্তিই কি শ্রেয়? পামারষ্টনের নামই কি ইংলণ্ডের প্রাতঃস্মরণীয়ের মধ্যে—সর্ব্বাগ্রগণনীয়ের মধ্যে স্থান পাইল? দলের চেষ্টায় যদি কৃত্রিম উপায়ে সেই উদ্দেশ্য কিয়ৎপরিমাণে সাধিত হইয়া থাকে, তবে দলের চেষ্টাকে প্রশংসা করিতে পারি না—যদি না হইয়া থাকে, তবে সেই বৃহৎ আড়ম্বরে বিশেষ গৌরব করিবার এমনি কি কারণ আছে?

যাঁহাদের নামস্মরণ আমাদের সমস্ত দিনের বিচিত্র মঙ্গলচেষ্টার উপযুক্ত উপক্রমণিকা বলিয়া গণ্য হইতে পারে, তাঁহারাই আমাদের প্রাতঃস্মরণীয়। তাহার অধিক আর বোঝাই করিবার কোনো দরকার

নাই। ব্যয়কাতর কৃপণের ধনের মত, ছোট-বড়-মাঝারি, ক্ষণিক এবং চিরন্তন, সকলপ্রকার মাহাত্ম্যকেই শাদা-পাথর দিয়া চাপা রাখিবার প্রবৃত্তি যদি আমাদের না হয়, তবে তাহা লইয়া লজ্জা না করিলেও চলে। ভক্তিকে যদি প্রতিদিনের ব্যবহারযোগ্য করিতে হয়, তবে তাহা হইতে প্রতিদিনের অভ্যাগত অনাবশ্যক ভারগুলি বিদায় করিবার উপায় রাখিতে হয়, তাহার বিপরীত প্রণালীতে সমস্তই স্তূপাকার করিবার চেষ্টা না করাই ভাল।

যাহা বিনষ্ট হইবার, তাহাকে বিনষ্ট হইতে দিতে হইবে, যাহা অগ্নিতে দগ্ধ হইবার, তাহা ভস্ম হইয়া যাক্! মৃতদেহ যদি লুপ্ত হইয়া না যাইত, তবে পৃথিবীতে জীবিতের অবকাশ থাকিত না, ধরাতল একটি প্রকাণ্ড কবরস্থান হইয়া থাকিত। আমাদের হৃদয়ের ভক্তিকে পৃথিবীর ছোট এবং বড়, খাঁটি এবং ঝুঁটা, সমস্ত বড়ত্বের গোরস্থান করিয়া রাখিতে পারি না। যাহা চিরজীবী, তাহাই থাক্; যাহা মৃতদেহ, আজবাদে-কাল কীটের খাদ্য হইবে, তাহাকে মুগ্ধস্নেহে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা না করিয়া শোকের সহিত অথচ বৈরাগ্যের সহিত শ্মশানে ভস্ম করিয়া আসাই বিহিত। পাছে ভুলি, এই আশঙ্কায় নিজেকে উত্তেজিত রাখিবার জন্য কল বানাইবার চেয়ে ভোলাই ভাল। ঈশ্বর আমাদিগকে দয়া করিয়াই বিস্মরণশক্তি দিয়াছেন।

সঞ্চয় নিতান্ত অধিক হইয়া উঠিতে থাকিলে, বাছাই-করা দুঃসাধ্য হয়। তাহা ছাড়া সঞ্চয়ের নেশা বড় দুর্জ্জয় নেশা—একবার যদি হাতে কিছু জমিয়া যায়, তবে জমাইবার ঝোঁক আর সাম্‌লানো যায় না। আমাদের দেশে ইহাকেই বলে—নিরেনব্বইয়ের ধাক্কা। য়ুরোপ একবার বড়লোক জমাইতে আরম্ভ করিয়া এই নিরেনব্বইয়ের আবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া গেছে। য়ুরোপে দেখিতে পাই, কেহ বা ডাকের টিকিট জমায়, কেহ বা দেশালাইয়ের বাক্সের কাগজের আচ্ছাদন জমায়, কেহ বা

পুরাতন জুতা, কেহ বা বিজ্ঞাপনের ছবি জমাইতে থাকে—সেই নেশার রোখ যতই চড়িতে থাকে, ততই এই সকল জিনিষের একটা কৃত্রিম মূল্য অসম্ভবরূপে বাড়িয়া উঠে। তেম্‌নি য়ুরোপে মৃত বড়লোক জমাইবার যে একটা প্রচণ্ড নেশা আছে, তাহাতে মূল্যের বিচার আর থাকে না। কাহাকেও আর বাদ দিতে ইচ্ছা করে না। যেখানে একটুমাত্র উচ্চতা বা বিশেষত্ব আছে, সেইখানেই য়ুরোপ তাড়াতাড়ি সিঁদূর মাথাইয়া দিয়া ঘণ্টা নাড়িতে থাকে। দেখিতে দেখিতে দল জুটিয়া যায়।

বস্তুত মাহাত্ম্যের সঙ্গে ক্ষমতা বা প্রতিভার প্রভেদ আছে। মহাত্মারা আমাদের কাছে এমন একটি আদর্শ রাখিয়া যান, যাহাতে তাঁহাদিগকে ভক্তিভরে স্মরণ করিলে জীবন মহত্ত্বের পথে আকৃষ্ট হয়, কিন্তু ক্ষমতাশালীকে স্মরণ করিয়া আমরা যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইতে পারি, তাহা নহে। ভক্তিভাবে শেক্‌স্‌পিয়রের স্মরণমাত্র আমাদিগকে শেক্‌স্‌পিয়রের গুণের অধিকারী করে না, কিন্তু যথার্থভাবে কোন সাধুকে অথবা বীরকে স্মরণ করিলে আমাদের পক্ষে সাধুত্ব বা বীরত্ব কিয়ৎপরিমাণেও সবল হইয়া আসে।

তবে গুণিসম্বন্ধে আমাদের কি কর্ত্তব্য? গুণীকে তাঁহার গুণের দ্বারা স্মরণ করাই আমাদের স্বাভাবিক কর্ত্তব্য। শ্রদ্ধার সহিত তানসেনের গানের চর্চ্চা করিয়াই গুণমুগ্ধ গায়কগণ তানসেনকে যথার্থভাবে স্মরণ করে। ধ্রুপদ শুনিলে যাহার গায়ে জ্বর আসে, সে-ও তানসেনের প্রতিমা গড়িবার জন্য চাঁদা দিয়া ঐহিক-পারত্রিক কোন ফললাভ করে, এ কথা মনে করিতে পারি না। সকলকেই যে গানে ওস্তাদ হইতে হইবে, এমন কোন অবশ্যবাধ্যতা নাই। কিন্তু সাধুতা বা বীরত্ব সকলেরই পক্ষে আদর্শ। সাধুদিগের এবং মহৎকর্ম্মে প্রাণবিসর্জ্জনপর বীরদিগের স্মৃতি সকলেরই পক্ষে মঙ্গলকর। কিন্তু দল বাঁধিয়া ঋণশোধ করাকে

সেই স্মৃতিপালন কহে না; স্মরণব্যাপার প্রত্যেকের পক্ষে প্রত্যহের কর্ত্তব্য।

য়ুরোপে এই ক্ষমতা এবং মাহাত্ম্যের প্রভেদ লুপ্তপ্রায়। উভয়েরই জয়ধ্বজা একই-রকম—এমন কি, মাহাত্ম্যের পতাকাই যেন কিছু খাটো। পাঠকগণ অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, বিলাতে অভিনেতা আর্ভিঙের সম্মান পরমসাধুর প্রাপ্য সম্মান অপেক্ষা অল্প নহে। রামমোহন রায় আজ যদি ইংলণ্ডে যাইতেন, তবে তাঁহার গৌরব ক্রিকেট্-খেলোয়াড় রঞ্জিতসিংহের গৌরবের কাছে থর্ব্ব হইয়া থাকিত।

আমরা কবিচরিতনামক প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি, য়ুরোপে ক্ষমতা-শালী লোকের জীবনচরিত লেখার একটা নিরতিশয় উদ্যম আছে। য়ুরোপকে চরিতবায়ুগ্রস্ত বলা যাইতে পারে। কোনোমতে একটা যে-কোনো-প্রকারের বড়লোকত্বের সুদূর গন্ধটুকু পাইলেই তাহার সমস্ত চিঠিপত্র, গল্পগুজব, প্রাত্যহিক ঘটনার সমস্ত আবর্জ্জনা সংগ্রহ করিয়া মোটা দুই ভল্যুমে জীবনচরিত লিখিবার জন্য লোকে হাঁ করিয়া বসিয়া থাকে। যে নাচে, তাহার জীবনচরিত, যে গান করে, তাহার জীবন-চরিত, যে হাসাইতে পারে, তাহার জীবনচরিত—জীবন যাহার যেমনই হোক্, যে লোক কিছু-একটা পারে, তাহারই জীবনচরিত! কিন্তু যে মহাত্মা জীবনযাত্রার আদর্শ দেখাইয়াছেন, তাঁহারই জীবনচরিত সার্থক—যাঁহারা সমস্ত জীবনের দ্বারা কোনো কাজ করিয়াছেন, তাঁহাদেরই জীবন আলোচ্য—যিনি কবিতা লিখিয়াছেন, গান তৈরি করিয়াছেন, তিনি কবিতা এবং গানই দান করিয়া গেছেন, তিনি জীবন দান করিয়া যান নাই, তাঁহার জীবনচরিতে কাহার কি প্রয়োজন? টেনিসনের কবিতা পড়িয়া আমরা টেনিসন্‌কে যত বড় করিয়া জানিয়াছি, তাঁহার জীবনচরিত পড়িয়া তাঁহাকে তাহা অপেক্ষা অনেক ছোট করিয়া জানিয়াছি মাত্র।

কৃত্রিম আদর্শে মানুষকে এইরূপ নির্বিবেক করিয়া তোলে। মেকী এবং খাঁটির এক দর হইয়া আসে। আমাদের দেশে আধুনিককালে পাপপুণ্যের আদর্শ কৃত্রিম হওয়াতে তাহার ফল কি হইয়াছে? ব্রাহ্মণের পায়ের ধূলা লওয়া এবং গঙ্গায় স্নান করাও পুণ্য, আবার অচৌর্য্য ও সত্যপরায়ণতাও পুণ্য, কিন্তু কৃত্রিমের সহিত খাঁটি পুণ্যের কোনো জাতিবিচার না থাকাতে, যে ব্যক্তি নিত্য গঙ্গাস্নান ও আচারপালন করে, সমাজে অলুব্ধ ও সত্যপরায়ণের অপেক্ষা তাহার পুণ্যের সম্মান কম নহে, বরঞ্চ বেশি। যে ব্যক্তি যবনের অন্ন খাইয়াছে, আর যে ব্যক্তি জাল মকদ্দমায় যবনের অন্নের উপায় অপহরণ করিয়াছে, উভয়েই পাপীর কোঠায় পড়ায় প্রথমোক্ত পাপীর প্রতি ঘৃণা ও দণ্ড যেন মাত্রায় বাড়িয়া উঠে।

য়ুরোপে তেম্নি মাহাত্ম্যের মধ্যে জাতিবিচার উঠিয়া গেছে। যে ব্যক্তি ক্রিকেট্‌খেলায় শ্রেষ্ঠ, যে অভিনয়ে শ্রেষ্ঠ, যে দানে শ্রেষ্ঠ, যে সাধুতায় শ্রেষ্ঠ, সকলেই গ্রেট্‌ম্যান্। একই-জাতীয় সম্মানস্বর্গে সকলেরই সদ্গতি। ইহাতে ক্রমেই যেন ক্ষমতার অর্ঘ্য মাহাত্ম্যের অপেক্ষা বেশি দাঁড়াইয়াছে। দলের হাতে বিচারের ভার থাকিলে, এইরূপ ঘটাই অনিবার্য্য। যে আচারপরায়ণ, সে ধর্ম্মপরায়ণের সমান হইয়া দাঁড়ায়, এমন কি, বেশি হইয়া ওঠে; যে ক্ষমতাশালী, সে মহাত্মাদের সমান, এমন কি, তাঁহাদের চেয়ে বড় হইয়া দেখা দেয়।

যথার্থ ভক্তির উপর পূজার ভার না দিয়া লোকারণ্যের উপর পূজার ভার দিলে দেবপূজার ব্যাঘাত ঘটে। বারোয়ারির দেবতার যত ধুম, গৃহদেবতা—ইষ্টদেবতার তত ধুম নহে। কিন্তু বারোয়ারির দেবতা কি মুখ্যত একটা অবান্তর উত্তেজনার উপলক্ষ্যমাত্র নহে? ইহাতে ভক্তির চর্চ্চা না হইয়া ভক্তির অবমাননা হয় না কি?

আমাদের দেশে আধুনিককালের বারোয়ারির শোকের মধ্যে—

বারোয়ারির স্মৃতিপালনচেষ্টার মধ্যে, গভীর শূন্যতা দেখিয়া আমরা পদে-পদে ক্ষুব্ধ হই। নিজের দেবতাকে কোন্ প্রাণে এমন কৃত্রিম সভায় উপস্থিত করিয়া পূজার অভিনয় করা হয়, বুঝিতে পারি না। সেই অভিনয়ের আয়োজনে যদি মাল্‌মসলা কিছু কম হয়, তবে আমরা পরস্পরকে লজ্জা দিই—কিন্তু লজ্জার বিষয় গোড়াতেই। যিনি ভক্ত, তিনি মহতের মাহাত্ম্যকীর্ত্তন করিবেন, ইহা স্বাভাবিক এবং সকলের পক্ষেই শুভফলপ্রদ; কিন্তু মহাত্মাকে লইয়া সকলে মিলিয়া একদিন বারোয়ারির কোলাহল তুলিয়া কর্ত্তব্যসমাধার চেষ্টা লজ্জাকর এবং নিষ্ফল।

বিদ্যাসাগর আমাদের সমাজে ভক্তিলাভ করেন নাই, এ কথা কোনোমতেই বলা যায় না। তাঁহার প্রতি বাঙালিমাত্রেরই ভক্তি অকৃত্রিম। কিন্তু যাঁহারা বর্ষে বর্ষে বিদ্যাসাগরের স্মরণসভা আহ্বান করেন, তাঁহারা বিদ্যাসাগরের স্মৃতিরক্ষার জন্য সমুচিত চেষ্টা হইতেছে না বলিয়া আক্ষেপ করিতে থাকেন। ইহাতে কি এই প্রমাণ হয় যে, বিদ্যাসাগরের জীবন আমাদের দেশে নিষ্ফল হইয়াছে? তাহা নহে। তিনি আপন মহত্ত্বদ্বারা দেশের হৃদয়ে অমরস্থান অধিকার করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। নিষ্ফল হইয়াছে তাঁহার স্মরণসভা। বিদ্যাসাগরের জীবনের যে উদ্দেশ্য, তাহা তিনি নিজের ক্ষমতাবলেই সাধন করিয়াছেন—স্মরণসভার যে উদ্দেশ্য, তাহা সাধন করিবার ক্ষমতা স্মরণসভার নাই, উপায় সে জানে না।

মঙ্গলভাব স্বভাবতই আমাদের কাছে কত পূজ্য, বিদ্যাসাগর তাহার দৃষ্টান্ত। তাঁহার অসামান্য ক্ষমতা অনেক ছিল, কিন্তু সেই সকল ক্ষমতায় তিনি আমাদিগকে আকর্ষণ করেন নাই। তাঁহার দয়া, তাঁহার অকৃত্রিম অশ্রান্ত লোকহিতৈষাই তাঁহাকে বাংলাদেশের আবালবৃদ্ধবনিতার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। নূতন ফ্যাশনের টানে পড়িয়া আমরা যতই আড়ম্বর করিয়া যত চেষ্টাই করি না কেন, আমাদের অন্তঃকরণ

স্বভাবতই শক্তি-উপাসনায় মাতে না। ক্ষমতা আমাদের আরাধ্য নহে, মঙ্গলই আমাদের আরাধ্য। আমাদের ভক্তি শক্তির অভ্রভেদী সিংহদ্বারে নহে, পুণ্যের স্নিগ্ধ-নিভৃত দেবমন্দিরেই মস্তক নত করে।

আমরা বলি—কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি। যিনি ক্ষমতাপন্ন লোক, তিনি নিজের কীর্ত্তির মধ্যেই নিজে বাঁচিয়া থাকেন। তিনি যদি নিজেকে বাঁচাইতে না পারেন, তবে তাঁহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা আমরা করিলে তাহা হাস্যকর হয়। বঙ্কিমকে কি আমরা স্বহস্তরচিত পাথরের মূর্ত্তিদ্বারা অমরত্বলাভে সহায়তা করিব? আমাদের চেয়ে তাঁহার ক্ষমতা কি অধিক ছিল না? তিনি কি নিজের কীর্ত্তিকে স্থায়ী করিয়া যান নাই? হিমালয়কে স্মরণ রাখিবার জন্য কি চাঁদা করিয়া তাহার একটা কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করার প্রয়োজন আছে? হিমালয়কে দর্শন করিতে গেলেই তাহার দেখা পাইব—অন্যত্র তাহাকে স্মরণ করিবার উপায় করিতে যাওয়া মূঢ়তা। কৃত্তিবাসের জন্মস্থানে বাঙালি একটা কোনোপ্রকারের ধুমধাম করে নাই বলিয়া বাঙালি কৃত্তিবাসকে অবজ্ঞা করিয়াছে, এ কথা কেমন করিয়া বলিব? যেমন "গঙ্গা পূজি গঙ্গাজলে", তেমনি বাংলাদেশে মুদির দোকান হইতে রাজার প্রাসাদ পর্য্যন্ত কৃত্তিবাসের কীর্ত্তিদ্বারাই কৃত্তিবাস কত শতাব্দী ধরিয়া প্রত্যহ পূজিত হইয়া আসিতেছেন। এমন প্রত্যক্ষপূজা আর কিসে হইতে পারে?

য়ুরোপে যে দল বাঁধিবার ভাব আছে, তাহার উপযোগিতা নাই, এ কথা বলা মূঢ়তা। যে সকল কাজ বলসাধ্য,—বহুলোকের আলোচনার দ্বারা সাধ্য, সে সকল কাজে দল না বাঁধিলে চলে না। দল বাঁধিয়া য়ুরোপ যুদ্ধে, বিগ্রহে, বাণিজ্যে, রাষ্ট্রব্যাপারে বড় হইয়া উঠিয়াছে, সন্দেহ নাই। মৌমাছির পক্ষে যেমন চাক-বাঁধা, য়ুরোপের পক্ষে তেমনি দল-বাঁধা প্রকৃতিসিদ্ধ। সেইজন্য য়ুরোপ দল বাঁধিয়া দয়া করে,—ব্যক্তিগত দয়াকে প্রশ্রয় দেয় না, দল বাঁধিয়া পূজা করিতে যায়,—ব্যক্তিগত পূজাহ্নিকে

মন দেয় না ; দল বাঁধিয়া ত্যাগস্বীকার করে,—ব্যক্তিগত ত্যাগে তাহাদের আস্থা নাই। এই উপায়ে য়ুরোপ একপ্রকার মহত্ত্ব লাভ করিয়াছে, অন্যপ্রকার মহত্ব খোয়াইয়াছে। একাকী কর্ত্তব্যকর্ম্ম নিষ্পন্ন করিবার উৎসাহ তাহার নাই। আমাদের সমাজে প্রত্যেককে প্রত্যহই প্রত্যেক প্রহরেই ধর্ম্মপালন করিতে বাধ্য বলিয়া জানে। য়ুরোপে ধর্ম্মপালন করিতে হইলে কমিটিতে বা ধর্ম্মসভায় যাইতে হয়। সেখানে সম্প্রদায়গণই সদনুষ্ঠানে রত—সাধারণ লোকেরা স্বার্থসাধনে তৎপর। কৃত্রিম উত্তেজনার দোষ এই যে, তাহার অভাবে মানুষ অসহায় হইয়া পড়ে। দল বাঁধিলে পরস্পর পরস্পরকে ঠেলিয়া খাড়া করিয়া রাখে, কিন্তু দলের বাহিরে নামিয়া পড়িতে হয়। আমাদের দেশে প্রত্যেকের প্রত্যহের কর্ত্তব্য ধর্ম্মকর্ম্মরূপে নির্দ্দিষ্ট হওয়াতে আবালবৃদ্ধবনিতাকে যথাসম্ভব নিজের স্বার্থপ্রবৃত্তি ও পশুপ্রকৃতিকে সংযত করিয়া পরের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করিতে হয়, ইহাই আমাদের আদর্শ। ইহার জন্য সভা করিতে বা খবরের কাগজে রিপোর্ট পাঠাইতে হয় না। এইজন্য সাধারণত সমস্ত হিন্দুসমাজে একটি সাত্ত্বিকভাব বিরাজমান—এখানে ছোট-বড় সকলেই মঙ্গলচর্চ্চায় রত, কারণ গৃহই তাহাদের মঙ্গলচর্চ্চার স্থান। এই যে আমাদের ব্যক্তিগত মঙ্গলভাব, ইহাকে আমরা শিক্ষার দ্বারা উন্নত, অভিজ্ঞতার দ্বারা বিস্তৃত এবং জ্ঞানের দ্বারা উজ্জ্বলতর করিতে পারি ; কিন্তু ইহাকে নষ্ট হইতে দিতে পারি না, ইহাকে অবজ্ঞা করিতে পারি না,—য়ুরোপে ইহার প্রাদুর্ভাব নাই বলিয়া ইহাকে লজ্জা দিতে এবং ইহাকে লইয়া লজ্জা করিতে পারি না—দলকেই একমাত্র দেবতা জ্ঞান করিয়া তাহার নিকট ইহাকে ধূলিলুণ্ঠিত করিতে পারি না। যেখানে দল-বাঁধা অত্যাবশ্যক, সেখানে যদি দল বাঁধিতে পারি ত ভাল, যেখানে অনাবশ্যক, এমন কি, অসঙ্গত, সেখানেও দল বাঁধিবার চেষ্টায় শেষকালে দলের উগ্র নেশা যেন অভ্যাস না করিয়া বসি। সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বোচ্চে নিজের ব্যক্তিগতকৃত্য,

তাহা প্রাত্যহিক, তাহা চিরন্তন; তাহার পরে দলীয় কর্ত্তব্য, তাহা বিশেষ আবশ্যকসাধনের জন্য ক্ষণকালীন—তাহা অনেকটাপরিমাণে যন্ত্রমাত্র, তাহাতে নিজের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির সর্ব্বতোভাবে সম্পূর্ণ চর্চ্চা হয় না। তাহা ধর্ম্মসাধন অপেক্ষা প্রয়োজনসাধনের পক্ষে অধিক উপযোগী।

কিন্তু কালের এবং ভাবের পরিবর্ত্তন হইতেছে। চারিদিকেই দল বাঁধিয়া উঠিতেছে—কিছুই নিভৃত এবং কেহই গোপন থাকিতেছে না। নিজের কীর্ত্তির মধ্যেই নিজেকে কৃতার্থ করা, নিজের মঙ্গলচেষ্টার মধ্যেই নিজেকে পুরস্কৃত করা, এখন আর টেঁকে না। শুভকর্ম্ম এখন আর সহজ এবং আত্মবিস্মৃত নহে, এখন তাহা সর্ব্বদাই উত্তেজনার অপেক্ষা রাখে। যে সকল ভাল কাজ ধ্বনিত হইয়া উঠে না, আমাদের কাছে তাহার মূল্য প্রতিদিন কমিয়া আসিতেছে, এইজন্য ক্রমশ আমাদের গৃহ পরিত্যক্ত, আমাদের জনপদ নিঃসহায়, আমাদের জন্মগ্রাম রোগ-জীর্ণ, আমাদের পল্লীর সরোবরসকল পঙ্কদূষিত, আমাদের সমস্ত চেষ্টাই কেবল সভাসমিতি এবং সংবাদপত্রহাটের মধ্যে। ভ্রাতৃভাব এখন ভ্রাতাকে ছাড়িয়া বাহিরে ফিরিতেছে, দয়া এখন দীনকে ছাড়িয়া সংবাদদাতার স্তম্ভের উপর চড়িয়া দাঁড়াইতেছে এবং লোকহিতৈষিতা এখন লোককে ছাড়িয়া রাজদ্বারে খেতাব খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। ম্যাজিষ্ট্রেটের তাড়া না খাইলে এখন আমাদের গ্রামে স্কুল হয় না, রোগী ঔষধ পায় না, দেশের জলকষ্ট দূর হয় না। এখন ধ্বনি এবং ধন্যবাদ এবং করতালির নেশা যখন ক্রমে চড়িয়া উঠিয়াছে, তখন সেই প্রলোভনের ব্যবস্থা রাখিতে হয়। ঠিক যেন বাছুরটাকে কশাইখানায় বিক্রয় করিয়া ফুঁকা-দেওয়া দুধের ব্যবসায় চালাইতে হইতেছে।

অতএব আমরা যে দল বাঁধিয়া শোক, দল বাঁধিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য পরস্পরকে প্রাণপণে উৎসাহিত করিতেছি, এখন তাহার সময় আসিয়াছে। কিন্তু পরিবর্ত্তনের সন্ধিকালে ঠিক নিয়মমত কিছুই হয় না।

সকালে হয় ত শীতের আভাস, বিকালে হয় ত বসন্তের বাতাস দিতে থাকে। দিশী-হাল্কা কাপড় গায়ে দিলে হঠাৎ সর্দ্দি লাগে, বিলাতি মোটা-কাপড় গায়ে দিলে ঘর্ম্মাক্তকলেবর হইতে হয়। সেইজন্য আজকাল দিশী ও বিলাতি কোন নিয়মই পূরাপূরি খাটে না। যখন বিলাতি-প্রথায় কাজ করিতে যাই, দেশী-সংস্কার অলক্ষ্যে হৃদয়ের অন্তঃপুরে থাকিয়া বাধা দিতে থাকে, আমরা লজ্জায়-ধিক্কারে অস্থির হইয়া উঠি - দেশীভাবে যখন কাজ ফাঁদিয়া বসি, তখন বিলাতের রাজ-অতিথি আসিয়া নিজের বসিবার উপযুক্ত আসন না পাইয়া নাসা কুঞ্চিত করিয়া সমস্ত মাটি করিয়া দেয়। সভাসমিতি নিয়মমত ডাকি, অথচ তাহা সফল হয় না,—চাঁদার খাতা খুলি, অথচ তাহাতে যেটুকু অঙ্কপাত হয়, তাহাতে কেবল আমাদের কলঙ্ক ফুটিয়া উঠে।

আমাদের সমাজে যেরূপ বিধান ছিল, তাহাতে আমাদের প্রত্যেক গৃহস্থকে প্রতিদিন চাঁদা দিতে হইত। তাহার তহবিল আত্মীয়স্বজন, অতিথি-অভ্যাগত, দীনদুঃখী, সকলের জন্যই ছিল। এখনো আমাদের দেশে যে দরিদ্র, সে নিজের ছোটভাইকে স্কুলে পড়াইতেছে, ভগিনীর বিবাহ দিতেছে, পৈতৃক নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়া সাধন করিতেছে, বিধবা পিসীমাসীকে সসন্তান পালন করিতেছে। ইহাই দিশীমতে চাঁদা, ইহার উপরে আবার বিলাতিমতে চাঁদা লোকের সহ্য হয় কি করিয়া? ইংরাজ নিজের বয়স্ক ছেলেকে পর্য্যন্ত স্বতন্ত্র করিয়া দেয়, তাহার কাছে চাঁদার দাবী করা অসঙ্গত নহে। নিজের ভোগেরই জন্য যাহার তহবিল, তাহাকে বাহ্য উপায়ে স্বার্থত্যাগ করাইলে ভালই হয়। আমাদের কয়জন লোকের নিজের ভোগের জন্য কতটুকু উদ্বৃত্ত থাকে? ইহার উপরে বারোমাসে তেরোশত নূতন-নূতন অনুষ্ঠানের জন্য চাঁদা চাহিতে আসিলে বিলাতী সভ্যতার উত্তেজনাসত্ত্বেও গৃহীর পক্ষে বিনয়রক্ষা করা কঠিন হয়। আমরা ক্রমাগতই লজ্জিত হইয়া বলিতেছি, এত-বড় অনুষ্ঠানপত্র বাহির করিলাম,

টাকা আসিতেছে না কেন, এত-বড় ঢাক পিটাইতেছি, টাকা আসিয়া পড়িতেছে না কেন, এত-বড় কাজ আরম্ভ করিলাম, অর্থাভাবে বন্ধ হইয়া যাইতেছে কেন? বিলাত হইলে এমন হইত, তেমন হইত, হুহু করিয়া মুষলধারে টাকা বর্ষিত হইয়া যাইত,—কবে আমরা বিলাতের মত হইব?

বিলাতের আদর্শ আসিয়া পৌঁছিয়াছে, বিলাতের অবস্থা এখনো বহুদূরে। বিলাতী মতের লজ্জা পাইয়াছি, কিন্তু সে লজ্জা নিবারণের বহুমূল্য বিলাতী বস্ত্র এখনো পাই নাই। সকলদিকেই টানাটানি করিয়া মরিতেছি। এখন সর্ব্বসাধারণে চাঁদা দিয়া যে-সকল কাজের চেষ্টা করে, পূর্ব্বে আমাদের দেশে ধনীরা তাহা একাকী করিতেন—তাহাতেই তাঁহাদের ধনের সার্থকতা ছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের দেশে সাধারণ গৃহস্থ সমাজকৃত্য শেষ করিয়া নিজের স্বাধীন ভোগের জন্য উদ্বৃত্ত কিছুই পাইত না, সুতরাং অতিরিক্ত কোনো কাজ না করিতে পারা তাহার পক্ষে লজ্জার বিষয় ছিল না। যে সকল ধনীর ভাণ্ডারে উদ্বৃত্ত অর্থ থাকিত, ইষ্টাপূর্ত্তকাজের জন্য তাহাদেরই উপর সমাজের সম্পূর্ণ দাবী থাকিত। তাহারা সাধারণের অভাবপূরণ করিবার জন্য ব্যয়সাধ্য মঙ্গলকর্ম্মে প্রবৃত্ত না হইলে সকলের কাছে লাঞ্ছিত হইত—তাহাদের নামোচ্চারণও অশুভকর বলিয়া গণ্য হইত। ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বরই বিলাতী ধনীর প্রধান শোভা, মঙ্গলের আয়োজন ভারতের ধনীর প্রধান শোভা। সমাজস্থ বন্ধুদিগকে বহুমূল্য পাত্রে বহুমূল্য ভোজ দিয়া বিলাতের ধনী তৃপ্ত, আহূত-রবাহূত-অনাহূতদিগকে কলার পাতায় অন্নদান করিয়া আমাদের ধনীরা তৃপ্ত। ঐশ্বর্য্যকে মঙ্গলদানের মধ্যে প্রকাশ করাই ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য্য—ইহা নীতিশাস্ত্রের নীতিকথা নহে—আমাদের সমাজে ইহা এতকাল পর্য্যন্ত প্রত্যহই ব্যক্ত হইয়াছে—সেইজন্যই সাধারণ গৃহস্থের কাছে আমাদিগকে চাঁদা চাহিতে হয় নাই। ধনীরাই আমাদের দেশে দুর্ভিক্ষকালে অন্ন, জলাভাবকালে জল দান করিয়াছে,—তাহারাই দেশের শিক্ষাবিধান,

শিল্পের উন্নতি, আনন্দকর উৎসবরক্ষা ও গুণীর উৎসাহসাধন করিয়াছে, হিতানুষ্ঠানে আজ যদি আমরা পূর্ব্বাভ্যাসক্রমে তাহাদের দ্বারস্থ হই, তবে সামান্য ফল পাইয়া অথবা নিষ্ফল হইয়া কেন ফিরিয়া আসি? বরঞ্চ আমাদের মধ্যবিত্তগণ সাধারণ কাজে যেরূপ ব্যয় করিয়া থাকেন, সম্পদের তুলনা করিয়া দেখিলে ধনীরা তাহা করেন না। তাঁহাদের দ্বারবান্‌গণ স্বদেশের অভাবকে দেউড়ি পার হইয়া প্রাসাদে ঢুকিতে দেয় না—ভ্রমক্রমে ঢুকিতে দিলেও ফিরিবার সময় তাহার মুখে অধিক উল্লাসের লক্ষণ দেখা যায় না! ইহার কারণ, আমাদের ধনীদের ঘরে বিলাতের বিলাসিতা প্রবেশ করিয়াছে, অথচ বিলাতের ঐশ্বর্য্য নাই। নিজেদের ভোগের জন্য তাহাদের অর্থ উদ্বৃত্ত থাকে বটে, কিন্তু সেই ভোগের আদর্শ বিলাতের। বিলাতের ভোগীরা ভারবিহীন স্বাধীন ঐশ্বর্য্যশালী, নিজের ভাণ্ডারের সম্পূর্ণ কর্ত্তা। সমাজবিধানে আমরা তাহা নহি। অথচ ভোগের আদর্শ সেই বিলাতি ভোগীর অনুরূপ হওয়াতে খাটে-পালঙ্কে, বসনে-ভূষণে, গৃহসজ্জায়, গাড়িতে-জুড়িতে আমাদের ধনীদিগকে আর বদান্যতার অবসর দেয় না—তাহাদের বদান্যতা বিলাতী জুতাওয়ালা, টুপিওয়ালা, ঝাড়লণ্ঠনওয়ালা, চৌকিটেবিল-ওয়ালার সুবৃহৎ পকেটের মধ্যে নিজেকে উজাড় করিয়া দেয়, শীর্ণ কঙ্কালসার দেশ রিক্তহস্তে ম্লানমুখে দাঁড়াইয়া থাকে! দেশী গৃহস্থের বিপুল কর্ত্তব্য এবং বিলাতি ভোগীর বিপুল ভোগ, এই দুই ভার একলা কয়জনে বহন করিতে পারে?

বিদ্যাসাগরচরিত।*

১

বিদ্যাসাগরের চরিত্রে যাহা সর্ব্বপ্রধান গুণ—যে গুণে তিনি পল্লী-আচারের ক্ষুদ্রতা, বাঙালীজীবনের জড়ত্ব সবলে ভেদ করিয়া, একমাত্র নিজের গতিবেগপ্রাবল্যে কঠিন প্রতিকূলতার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া—হিন্দুত্বের দিকে নহে, সাম্প্রদায়িকতার দিকে নহে—করুণার অশ্রুজলপূর্ণ উন্মুক্ত অপার মনুষ্যত্বের অভিমুখে আপনার দৃঢ়নিষ্ঠ একাগ্র একক জীবনকে প্রবাহিত করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, আমি যদি অদ্য তাঁহার সেই গুণকীর্ত্তন করিতে বিরত হই, তবে আমার কর্ত্তব্য একেবারেই অসম্পন্ন থাকিয়া যায়। কারণ, বিদ্যাসাগরের জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে এই কথাটি বারংবার মনে উদয় হয় যে, তিনি যে বাঙালী বড়লোক ছিলেন, তাহা নহে, তিনি যে রীতিমত হিন্দু ছিলেন, তাহাও নহে—তিনি তাহা অপেক্ষাও অনেক বেশি বড় ছিলেন, তিনি যথার্থ মানুষ ছিলেন। বিদ্যাসাগরের জীবনীতে এই অনন্যসুলভ মনুষ্যত্বের প্রাচুর্য্যই সর্ব্বোচ্চ গৌরবের বিষয়। তাঁহার সেই পর্ব্বতপ্রমাণ চরিত্রমাহাত্ম্যে তাঁহারই কৃতকীর্ত্তিকেও খর্ব্ব করিয়া রাখিয়াছে।

তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি বঙ্গভাষা। যদি এই ভাষা কখন সাহিত্য-সম্পদে ঐশ্বর্য্যশালিনী হইয়া উঠে, যদি এই ভাষা অক্ষয় ভাবজননীরূপে মানবসভ্যতার ধাত্রীগণের ও মাতৃগণের মধ্যে গণ্য হয়, যদি এই ভাষা পৃথিবীর শোকদুঃখের মধ্যে এক নূতন সান্ত্বনাস্থল—সংসারের তুচ্ছতা

---

* ১৩০২ সালের ১৩ই শ্রাবণ অপরাহ্নে বিদ্যাসাগরের স্মরণার্থসভার সাংবৎসরিক অধিবেশনে এমারেল্ড থিয়েটার রঙ্গমঞ্চে পঠিত।

ও ক্ষুদ্র স্বার্থের মধ্যে এক মহত্ত্বের আদর্শলোক, দৈনন্দিন মানবজীবনের অবসাদ ও অস্বাস্থ্যের মধ্যে সৌন্দর্য্যের এক নিভৃত নিকুঞ্জবন রচনা করিতে পারে, তবেই তাঁহার এই কীর্ত্তি তাঁহার উপযুক্ত গৌরব লাভ করিতে পারিবে।

বাংলাভাষার বিকাশে বিদ্যাসাগরের প্রভাব কিরূপ কার্য্য করিয়াছে, এখানে তাহা স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দেশ করা আবশ্যক।

বিদ্যাসাগর বাংলাভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্ব্বে বাংলায় গদ্যসাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল, কিন্তু তিনিই সর্ব্বপ্রথমে বাংলা-গদ্যে কলানৈপুণ্যের অবতারণা করেন। ভাষা যে কেবল ভাবের একটা আধারমাত্র নহে, তাহার মধ্যে যেন-তেন-প্রকারেণ কতকগুলা বক্তব্য-বিষয় পূরিয়া দিলেই যে কর্ত্তব্যসমাপন হয় না, বিদ্যাসাগর দৃষ্টান্তদ্বারা তাহাই প্রমাণ করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন যে, যতটুকু বক্তব্য, তাহা সরল করিয়া, সুন্দর করিয়া এবং সুশৃঙ্খল করিয়া ব্যক্ত করিতে হইবে। আজিকার দিনে এ কাজটিকে তেমন বৃহৎ বলিয়া মনে হইবে না, কিন্তু সমাজবন্ধন যেমন মনুষ্যত্ববিকাশের পক্ষে অত্যাবশ্যক, তেমনি ভাষাকে কলাবন্ধনের দ্বারা সুন্দররূপে সংযমিত না করিলে, সে ভাষা হইতে কদাচ প্রকৃত সাহিত্যের উদ্ভব হইতে পারে না। সৈন্যদলের দ্বারা যুদ্ধ সম্ভব, কেবলমাত্র জনতার দ্বারা নহে;—জনতা নিজেকেই নিজে খণ্ডিত-প্রতিহত করিতে থাকে, তাহাকে চালনা করাই কঠিন। বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করিয়া তাহাকে সহজ গতি এবং কার্য্যকুশলতা দান করিয়াছেন—এখন তাহার দ্বারা অনেক সেনাপতি ভাবপ্রকাশের কঠিন বাধাসকল পরাহত করিয়া সাহিত্যের নব নব ক্ষেত্র আবিষ্কার ও অধিকার করিয়া লইতে পারেন—কিন্তু যিনি এই সেনানীর রচনাকর্ত্তা, যুদ্ধজয়ের যশোভাগ সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাকেই দিতে হয়।

বাংলাভাষাকে পূর্ব্বপ্রচলিত অনাবশ্যক সমাসাড়ম্বরভার হইতে মুক্ত করিয়া, তাহার পদগুলির মধ্যে অংশযোজনার সুনিয়ম স্থাপন করিয়া বিদ্যাসাগর যে বাংলাগদ্যকে কেবলমাত্র সর্ব্বপ্রকারব্যবহারযোগ্য করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন, তাহা নহে, তিনি তাহাকে শোভন করিবার জন্যও সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিলেন। গদ্যের পদগুলির মধ্যে একটা ধ্বনিসামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া, তাহার গতির মধ্যে একটি অনতিলক্ষ্য ছন্দঃস্রোত রক্ষা করিয়া, সৌম্য এবং সরল শব্দগুলি নির্ব্বাচন করিয়া বিদ্যাসাগর বাংলা-গদ্যকে সৌন্দর্য্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন। গ্রাম্যপাণ্ডিত্য এবং গ্রাম্যবর্ব্বরতা, উভয়ের হস্ত হইতেই উদ্ধার করিয়া তিনি ইহাকে পৃথিবীর ভদ্রসভার উপযোগী আর্য্যভাষারূপে গঠিত করিয়া গিয়াছেন। তৎপূর্ব্বে বাংলাগদ্যের যে অবস্থা ছিল, তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলে এই ভাষাগঠনে বিদ্যাসাগরের শিল্পপ্রতিভা ও সৃষ্টিক্ষমতার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়।

কিন্তু প্রতিভাসম্পন্ন বলিয়া বিদ্যাসাগরের সম্মান নহে। বিশেষত বিদ্যাসাগর যাহার উপর আপন প্রতিভা প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা প্রবহমাণ,—পরিবর্ত্তনশীল। ভাষা নদীস্রোতের মত—তাহার উপরে কাহারো নাম খুদিয়া রাখা যায় না। মনে হয়, যেন সে চিরকাল এবং সর্ব্বত্র স্বভাবতই এইভাবে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। বাস্তবিক সে যে কোন্ কোন্ নির্ঝরধারায় গঠিত ও পরিপুষ্ট, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে উজানমুখে গিয়া পুরাবৃত্তের দুর্গম গিরিশিখরে আরোহণ করিতে হয়। বিশেষ গ্রন্থ অথবা চিত্র অথবা মূর্ত্তি চিরকাল আপনার স্বাতন্ত্র্য-রক্ষা করিয়া আপন রচনাকর্ত্তাকে স্মরণ করাইয়া দেয়, কিন্তু ভাষা ছোট-বড় অসংখ্য লোকের নিকট হইতে জীবনলাভ করিতে করিতে ব্যাপ্ত হইয়া পূর্ব্ব ইতিহাস বিস্মৃত হইয়া চলিয়া যায়, বিশেষরূপে কাহারো নাম ঘোষণা করে না।

কিন্তু সেজন্য আক্ষেপ করিবার প্রয়োজন নাই; কারণ, বিদ্যাসাগরের গৌরব কেবলমাত্র তাঁহার প্রতিভার উপর নির্ভর করিতেছে না।

প্রতিভা মানুষের সমস্তটা নহে, তাহা মানুষের একাংশমাত্র। প্রতিভা মেঘের মধ্যে বিদ্যুতের মত, আর মনুষ্যত্ব চরিত্রের দিবালোক, তাহা সর্বব্যাপী ও স্থির। প্রতিভা মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অংশ—আর, মনুষ্যত্ব জীবনের সকল মুহূর্ত্তেই সকল কার্য্যেই আপনাকে ব্যক্ত করিতে থাকে। প্রতিভা অনেকসময়ে বিদ্যুতের ন্যায় আপনার আংশিকতাবশতই লোকচক্ষে তীব্রতররূপে আঘাত করে এবং চরিত্রমহত্ত্ব আপনার ব্যাপকতা-গুণেই প্রতিভা অপেক্ষা ম্লানতর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু চরিত্রের শ্রেষ্ঠতাই যে যথার্থ শ্রেষ্ঠতা, ভাবিয়া দেখিলে সে বিষয়ে কাহারো সংশয় থাকিতে পারে না।

ভাষা, প্রস্তর অথবা চিত্রপটের দ্বারা সত্য এবং সৌন্দর্য্য প্রকাশ করা ক্ষমতার কার্য্য, সন্দেহ নাই, তাহাতে বিচিত্র বাধা অতিক্রম এবং অসামান্য নৈপুণ্য প্রয়োগ করিতে হয়। কিন্তু নিজের সমগ্র জীবনের দ্বারা সেই সত্য ও সৌন্দর্য্য প্রকাশ করা তদপেক্ষা আরো বেশি দুরূহ, তাহাতে পদে পদে কঠিনতর বাধা অতিক্রম করিতে হয় এবং তাহাতে স্বাভাবিক সূক্ষ্ম বোধশক্তি ও নৈপুণ্য, সংযম ও বল অধিকতর আবশ্যক হয়।

এই চরিত্ররচনার প্রতিভা কোনো সাম্প্রদায়িক শাস্ত্র মানিয়া চলে না। প্রকৃত কবির কবিত্ব যেমন অলঙ্কারশাস্ত্রের অতীত, অথচ বিশ্বহৃদয়ের মধ্যে বিধিরচিত নিগূঢ়নিহিত এক অলিখিত অলঙ্কারশাস্ত্রের কোনো নিয়মের সহিত তাহার স্বভাবত কোনো বিরোধ হয় না, তেমনি যাঁহারা যথার্থ মনুষ্য, তাঁহাদের শাস্ত্র তাঁহাদের অন্তরের মধ্যে, অথচ বিশ্বব্যাপী মনুষ্যত্বের সমস্ত নিত্যবিধানগুলির সঙ্গে সে শাস্ত্র আপনি মিলিয়া যায়। অতএব, অন্যান্য প্রতিভায় যেমন "ওরিজিন্যালিটি" অর্থাৎ অনন্যতন্ত্রতা প্রকাশ পায়, মহচ্চরিত্রবিকাশেও সেইরূপ অনন্যতন্ত্রতার প্রয়োজন হয়।—অনেকে বিদ্যা-

সাগরের অনন্যতন্ত্র প্রতিভা ছিল না বলিয়া আভাস দিয়া থাকেন; তাঁহারা জানেন, অনন্যতন্ত্রত্ব কেবল সাহিত্যে এবং শিল্পে, বিজ্ঞানে এবং দর্শনেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। বিদ্যাসাগর এই অকৃতকীর্ত্তি অকিঞ্চিৎকর বঙ্গসমাজের মধ্যে নিজের চরিত্রকে মনুষ্যত্বের আদর্শরূপে প্রস্ফুট করিয়া যে এক অসামান্য অনন্যতন্ত্রত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বাংলার ইতিহাসে অতিশয় বিরল। এত বিরল যে, এক শতাব্দীর মধ্যে কেবল আর দুইএক-জনের নাম মনে পড়ে এবং তাঁহাদের মধ্যে রামমোহন রায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

অনন্যতন্ত্রতা শব্দটা শুনিবামাত্র তাহাকে সঙ্কীর্ণতা বলিয়া ভ্রম হইতে পারে; মনে হইতে পারে, তাহা ব্যক্তিগত বিশেষত্ব, সাধারণের সহিত তাহার যোগ নাই। কিন্তু সে কথা যথার্থ নহে। বস্তুত আমরা নিয়মের শৃঙ্খলে, জটিল কৃত্রিমতার বন্ধনে এতই জড়িত ও আচ্ছন্ন হইয়া থাকি যে, আমরা সমাজের কল-চালিত পুত্তলের মত হইয়া যাই; অধি-কাংশ কাজই সংস্কারাধীনে অন্ধভাবে সম্পন্ন করি; নিজত্ব কাহাকে বলে, জানি না, জানিবার আবশ্যকতা রাখি না। আমাদের ভিতরকার আসল মানুষটি জন্মাবধি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত প্রায় সুপ্তভাবেই কাটাইয়া দেয়, তাহার স্থানে কাজ করে একটা নিয়ম-বাঁধা যন্ত্র। যাঁহাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের পরিমাণ অধিক, চিরাগত প্রথা ও অভ্যাসের জড় আচ্ছাদনে তাঁহাদের সেই প্রবল শক্তিকে চাপা দিয়া রাখিতে পারে না। ইঁহারাই নিজের চরিত্রপুরীর মধ্যে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রাপ্ত হন। অন্তরস্থ মনুষ্যত্বের এই স্বাধীনতার নামই নিজত্ব। এই নিজত্ব ব্যক্তভাবে ব্যক্তিবিশেষের, কিন্তু নিগূঢ়ভাবে সমস্ত মানবের। মহৎব্যক্তিরা এই নিজত্বপ্রভাবে একদিকে স্বতন্ত্র,—একক, অন্যদিকে সমস্ত মানবজাতির সবর্ণ,—সহোদর। আমাদের দেশে রামমোহন রায় এবং বিদ্যাসাগর উভয়ের জীবনেই ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। একদিকে যেমন তাঁহারা ভারতবর্ষীয়, তেমনি অপরদিকে য়ুরোপীয় প্রকৃতির সহিত তাঁহাদের

চরিত্রের বিস্তর নিকটসাদৃশ্য দেখিতে পাই। অথচ তাহা অনুকরণগত সাদৃশ্য নহে। বেশভূষায়, আচারে-ব্যবহারে তাঁহারা সম্পূর্ণ বাঙালী ছিলেন; স্বজাতীয় শাস্ত্রজ্ঞানে তাঁহাদের সমতুল্য কেহ ছিল না; স্বজাতিকে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের মূলপত্তন তাঁহারাই করিয়া গিয়াছেন—অথচ নির্ভীক বলিষ্ঠতা, সত্যচারিতা, লোকহিতৈষা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা এবং আত্মনির্ভরতায় তাঁহারা বিশেষরূপে য়ুরোপীয় মহাজনদের সহিত তুলনীয় ছিলেন। য়ুরোপীয়দের তুচ্ছ বাহ্য অনুকরণের প্রতি তাঁহারা যে অবজ্ঞা-প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহাদের য়ুরোপীয়সুলভ গভীর আত্ম-সম্মানবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। য়ুরোপীয় কেন, সরল সত্যপ্রিয় সাঁওতালেরাও যে অংশে মনুষ্যত্বে ভূষিত, সেই অংশে বিদ্যাসাগর তাঁহার স্বজাতীয় বাঙালীর অপেক্ষা সাঁওতালের সহিত আপনার অন্তরের যথার্থ ঐক্য অনুভব করিতেন।

মাঝে মাঝে বিধাতার নিয়মের এরূপ আশ্চর্য্য ব্যতিক্রম হয় কেন, বিশ্বকর্ম্মা যেখানে চারকোটি বাঙালী নির্ম্মাণ করিতেছিলেন, সেখানে হঠাৎ দুইএকজন মানুষ গড়িয়া বসেন কেন, তাহা বলা কঠিন। কি নিয়মে বড়লোকের অভ্যুত্থান হয়, তাহা সকল দেশেই রহস্যময়—আমাদের এই ক্ষুদ্রকর্ম্মা ভীরুহৃদয়ের দেশে সে রহস্য দ্বিগুণতর দুর্ভেদ্য। বিদ্যাসাগরের চরিত্রসৃষ্টিও রহস্যাবৃত—কিন্তু ইহা দেখা যায়, সে চরিত্রের ছাঁচ ছিল ভাল। ঈশ্বরচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষের মধ্যে মহত্ত্বের উপকরণ প্রচুরপরিমাণে সঞ্চিত ছিল।

বিদ্যাসাগরের জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা করিলে প্রথমেই তাঁহার পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। লোকটি অনন্যসাধারণ ছিলেন, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

মেদিনীপুরজেলায় বনমালিপুরে তাঁহার পৈতৃক বাসস্থান ছিল। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পরে বিষয়বিভাগ লইয়া সহোদরদের সহিত মনান্তর

হওয়ায় তিনি সংসারত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। বহুকাল পরে তর্কভূষণ দেশে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার স্ত্রী দুর্গাদেবী ভাশুর ও দেবরগণের অনাদরে প্রথমে শ্বশুরালয় হইতে বীরসিংহগ্রামে পিত্রালয়ে, পরে সেখানেও ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়ার লাঞ্ছনায় বৃদ্ধপিতার সাহায্যে পিতৃভবনের অনতিদূরে এক কুটীরে বাস করিয়া চরকা কাটিয়া দুই পুত্র ও চারি কন্যা সহ বহুকষ্টে দিনপাত করিতেছেন। তর্কভূষণ ভ্রাতাদের আচরণ শুনিয়া নিজের স্বত্ব ও তাঁহাদের সংস্রব ত্যাগ করিয়া ভিন্নগ্রামে দারিদ্র্য অবলম্বন করিয়া রহিলেন। কিন্তু যাঁহার স্বভাবের মধ্যে মহত্ত্ব আছে, দারিদ্র্যে তাঁহাকে দরিদ্র করিতে পারে না। বিদ্যাসাগর স্বয়ং তাঁহার পিতামহের যে চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন, স্থানে স্থানে তাহা উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা করি।

"তিনি নিরতিশয় তেজস্বী ছিলেন; কোন অংশে কাহারও নিকট অবনত হইয়া চলিতে, অথবা কোনপ্রকারে অনাদর বা অবমাননা সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি সকল স্থলে, সকল বিষয়ে, স্বীয় অভিপ্রায়ের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতেন, অন্যদীয় অভিপ্রায়ের অনুবর্ত্তন, তদীয় স্বভাব ও অভ্যাসের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। উপকারপ্রত্যাশায়, অথবা অন্য কোনও কারণে, তিনি কখনও পরের উপাসনা বা আনুগত্য করিতে পারেন নাই।" *

ইহা হইতেই শ্রোতৃগণ বুঝিতে পারিবেন, একান্নবর্ত্তী পরিবারে কেন এই অগ্নিখণ্ডটিকে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। তাঁহারা পাঁচ সহোদর ছিলেন, কিন্তু তিনি একাই নীহারিকাচক্র হইতে বিচ্ছিন্ন জ্যোতিষ্কের মত আপন বেগে বাহিরে বিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। একান্নবর্ত্তী পরিবারের বহুভারাক্রান্ত যন্ত্রেও তাঁহার কঠিন চরিত্রস্বাতন্ত্র্য পেষণ করিয়া দিতে পারে

* স্বরচিত বিদ্যাসাগরচরিত, ৩১ পৃষ্ঠা।

"তাঁহার শ্যালক রামসুন্দর বিদ্যাভূষণ গ্রামের প্রধান বলিয়া পরিগণিত এবং সাতিশয় গর্ব্বিত ও উদ্ধতস্বভাব ছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, ভগিনীপতি রামজয় তাঁহার অনুগত হইয়া থাকিবেন। কিন্তু, তাঁহার ভগিনীপতি কিরূপ প্রকৃতির লোক, তাহা বুঝিতে পারিলে, তিনি সেরূপ মনে করিতে পারিতেন না। রামজয় রামসুন্দরের অনুগত হইয়া না চলিলে, রামসুন্দর নানাপ্রকারে তাঁহাকে জব্দ করিবেন, অনেকে তাঁহাকে এই ভয় দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু রামজয়, কোনও কারণে, ভয় পাইবার লোক ছিলেন না; তিনি স্পষ্টবাক্যে বলিতেন, বরং বাসত্যাগ করিব, তথাপি শালার অনুগত হইয়া চলিতে পারিব না। শ্যালকের আক্রোশে, তাঁহাকে সময়ে সময়ে প্রকৃতপ্রস্তাবে, একঘরিয়া হইয়া থাকিতে ও নানাপ্রকার অত্যাচার-উপদ্রব সহ্য করিতে হইত, তিনি তাহাতে ক্ষুব্ধ বা চলচিত্ত হইতেন না।" *

তাঁহার তেজস্বিতার উদাহরণস্বরূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, জমিদার যখন তাঁহাদের বীরসিংহগ্রামের নূতন বাস্তবাটী নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর করিয়া দিবেন মানস করিয়াছিলেন, তখন রামজয় দানগ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই। গ্রামের অনেকেই বসতবাটী নাখেরাজ করিবার জন্য তাঁহাকে অনেক উপদেশ দিয়াছিল, কিন্তু তিনি কাহারও অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। এমন লোকের পক্ষে দারিদ্র্যও মহৈশ্বর্য্য, ইহাতে তাঁহার স্বাভাবিক সম্পদ্ জাজ্বল্যমান করিয়া তোলে। †

কিন্তু তর্কভূষণ যে আপন স্বাতন্ত্র্যগর্ব্বে সর্ব্বসাধারণকে অবজ্ঞা করিয়া দূরে থাকিতেন, তাহা নহে। বিদ্যাসাগর বলেন, "তর্কভূষণমহাশয় নিরতিশয় অমায়িক ও নিরহঙ্কার ছিলেন; কি ছোট, কি বড়, সর্ব্ববিধ

---

* স্বরচিত বিদ্যাসাগরচরিত, ৩২ পৃষ্ঠা।

† সহোদর শ্রীশম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত বিদ্যাসাগরজীবনচরিত, ৫ পৃষ্ঠা।

লোকের সহিত, সমভাবে সদয় ও সাদর ব্যবহার করিতেন। তিনি যাঁহাদিগকে কপটাচারী মনে করিতেন, তাঁহাদের সহিত সাধ্যপক্ষে আলাপ করিতেন না। তিনি স্পষ্টবাদী ছিলেন, কেহ রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইবেন, ইহা ভাবিয়া, স্পষ্টকথা বলিতে ভীত বা সঙ্কুচিত হইতেন না। তিনি যেমন স্পষ্টবাদী, তেমনই যথার্থবাদী ছিলেন। কাহারও ভয়ে বা অনুরোধে, অথবা অন্য কোনও কারণে তিনি, কখনও কোনও বিষয়ে অযথা নির্দ্দেশ করেন নাই। তিনি যাঁহাদিগকে আচরণে ভদ্র দেখিতেন, তাঁহাদিগকেই ভদ্র বলিয়া গণ্য করিতেন; আর যাঁহাদিগকে আচরণে অভদ্র দেখিতেন, বিদ্বান্, ধনবান্ ও ক্ষমতাপন্ন হইলেও, তাঁহাদিগকে ভদ্রলোক বলিয়া জ্ঞান করিতেন না।" *

এদিকে তর্কভূষণমহাশয়ের বল এবং সাহসও আশ্চর্য্য ছিল। সর্ব্বদাই তাঁহার হস্তে একখানি লৌহদণ্ড থাকিত। তখন দস্যুভয়ে অনেকে একত্র না হইয়া স্থানান্তরে যাইতে পারিত না, কিন্তু তিনি একা এই লৌহদণ্ডহস্তে অকুতোভয়ে সর্ব্বত্র যাতায়াত করিতেন; এমন কি, দুইচারিবার আক্রান্ত হইয়া দস্যুদিগকে উপযুক্তরূপ শিক্ষা দিয়াছিলেন। একুশবৎসর বয়সে একবার তিনি এক ভালুকের সম্মুখে পড়িয়াছিলেন। "ভালুক নখরপ্রহারে তাঁহার সর্ব্বশরীর ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিল, তিনিও অবিশ্রান্ত লৌহযষ্টি প্রহার করিতে লাগিলেন। ভালুক ক্রমে নিস্তেজ হইয়া পড়িলে, তিনি, তদীয় উদরে উপর্য্যুপরি পদাঘাত করিয়া, তাহার প্রাণসংহার করিলেন।" † অবশেষে শোণিত-ক্ষত বিক্ষতদেহে চারিক্রোশ পথ হাঁটিয়া মেদিনীপুরে এক আত্মীয়ের গৃহে শয্যা আশ্রয় করেন;—দুইমাস পরে সুস্থ হইয়া বাড়ী ফিরিতে পারেন।

* স্বরচিত বিদ্যাসাগরচরিত, ৩৪ পৃষ্ঠা।
† স্বরচিত বিদ্যাসাগরচরিত।

আর একটিমাত্র ঘটনা উল্লেখ করিলে তর্কভূষণের চরিত্রচিত্র সম্পূর্ণ হইবে।

১৭৪২ শকের ১২ই আশ্বিন মঙ্গলবারে বিদ্যাসাগরের পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অদূরে কোমরগঞ্জে মধ্যাহ্নে হাট করিতে গিয়াছিলেন। রামজয় তর্কভূষণ তাঁহাকে ঘরের একটি শুভসংবাদ দিতে বাহির হইয়াছিলেন। পথের মধ্যে পুত্রের সহিত দেখা হইলে বলিলেন, "একটি এঁড়েবাছুর হয়েছে।" শুনিয়া ঠাকুরদাস ঘরে আসিয়া গোয়ালের অভিমুখে গমন করিতেছিলেন; তর্কভূষণ হাসিয়া কহিলেন, "ওদিকে নয়, এদিকে এস"—বলিয়া সূতিকাগৃহে লইয়া নবপ্রসূত শিশু ঈশ্বরচন্দ্রকে নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইলেন।

এই কৌতুকহাস্যরশ্মিপাতে রামজয়ের বলিষ্ঠ উন্নতচরিত্র আমাদের নিকট প্রভাতের গিরিশিখরের ন্যায় রমণীয় বোধ হইতেছে। এই হাস্যময় তেজোময় নির্ভীক ঋজুস্বভাব পুরুষের মত আদর্শ বাংলাদেশে অত্যন্ত বিরল না হইলে বাঙালির মধ্যে পৌরুষের অভাব হইত না। আমরা তাঁহার চরিত্রবর্ণনা বিস্তারিতরূপে উদ্ধৃত করিলাম, তাহার কারণ, এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁহার পৌত্রকে আর কোন সম্পত্তি দান করিতে পারেন নাই, কেবল যে অক্ষয়সম্পদের উত্তরাধিকারবণ্টন একমাত্র ভগবানের হস্তে, সেই চরিত্রমাহাত্ম্য অখণ্ডভাবে তাঁহার জ্যেষ্ঠপৌত্রের অংশে রাখিয়া গিয়াছিলেন।

পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও সাধারণ লোক ছিলেন না। যখন তাঁহার বয়স ১৪।১৫বৎসর, এবং যখন তাঁহার মাতা দুর্গাদেবী চরকায় সুতা কাটিয়া একাকিনী তাঁহার দুই পুত্র এবং চারি কন্যার ভরণপোষণে প্রবৃত্ত ছিলেন, তখন ঠাকুরদাস উপার্জ্জনের চেষ্টায় কলিকাতায় প্রস্থান করিলেন।

কলিকাতায় আসিয়া প্রথমে তিনি তাঁহার আত্মীয় জগন্মোহন তর্কা-

লঙ্কারের বাড়ীতে উঠিলেন। ইংরাজি শিখিলে সওদাগর সাহেবদের হৌসে কাজ জুটিতে পারিবে জানিয়া প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলায় এক শিপ্ সরকারের বাড়ী ইংরাজি শিখিতে যাইতেন। যখন বাড়ী ফিরিতেন, তখন তর্কালঙ্কারের বাড়ীতে উপরিলোকের আহারের কাণ্ড শেষ হইয়া যাইত, সুতরাং তাঁহাকে রাত্রে অনাহারে থাকিতে হইত। অবশেষে তিনি তাঁহার শিক্ষকের এক আত্মীয়ের বাড়ী আশ্রয় লইলেন। আশ্রয়দাতার দারিদ্র্যনিবন্ধন একএকদিন তাঁহাকে সমস্তদিন উপবাসী থাকিতে হইত। একদিন ক্ষুধার জ্বালায় তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব একখানি পিতলের থালা ও একটি ছোট ঘটি কাঁসারির দোকানে বেচিতে গিয়াছিলেন। কাঁসারিরা তাহার পাঁচসিকা দর স্থির করিয়াছিল, কিন্তু কিনিতে সম্মত হইল না; বলিল, অজানিত লোকের নিকট হইতে পুরাণ বাসন কিনিয়া মাঝে মাঝে বড় ফেসাদে পড়িতে হয়। *

আর একদিন ক্ষুধার যন্ত্রণা ভুলিবার অভিপ্রায়ে মধ্যাহ্নে ঠাকুরদাস বাসা হইতে বাহির হইয়া পথে পথে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। "বড়বাজার হইতে ঠনঠনিয়া পর্য্যন্ত গিয়া এত অভিভূত হইলেন যে, আর তাঁহার চলিবার ক্ষমতা রহিল না। কিঞ্চিৎ পরেই তিনি এক দোকানের সম্মুখে উপস্থিত ও দণ্ডায়মান হইলেন; দেখিলেন, এক মধ্যবয়স্কা বিধবা নারী ঐ দোকানে বসিয়া মুড়িমুড়কি বেচিতেছেন। তাঁহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, ঐ স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, বাপাঠাকুর, দাঁড়াইয়া আছ কেন? ঠাকুরদাস তৃষ্ণার উল্লেখ করিয়া, পানার্থে জল প্রার্থনা করিলেন। তিনি, সাদর ও সস্নেহবাক্যে, ঠাকুরদাসকে বসিতে বলিলেন, এবং ব্রাহ্মণের ছেলেকে শুধু জল দেওয়া অবিধেয়, এই বিবেচনা করিয়া, কিছু মুড়কি ও জল দিলেন। ঠাকুরদাস, যেরূপ ব্যগ্র হইয়া, মুড়কিগুলি

* সহোদর শ্রীশম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত বিদ্যাসাগরজীবনচরিত।

খাইলেন, তাহা একদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া, ঐ স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, বাপাঠাকুর, আজ বুঝি তোমার খাওয়া হয় নাই? তিনি বলিলেন, না মা, আজ আমি, এখন পর্য্যন্ত কিছু খাই নাই। তখন সেই স্ত্রীলোক ঠাকুরদাসকে বলিলেন, বাপাঠাকুর, জল খাইয়ো না, একটু অপেক্ষা কর। এই বলিয়া নিকটবর্ত্তী গোয়ালার দোকান হইতে, সত্বর, দই কিনিয়া আনিলেন, এবং আরও মুড়কি দিয়া, ঠাকুরদাসকে পেট ভরিয়া ফলার করাইলেন; পরে তাঁহার মুখে সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া, জিদ্ করিয়া বলিয়া দিলেন, যেদিন তোমার এরূপ ঘটিবেক, এখানে আসিয়া ফলার করিয়া যাইবে।" *

এইরূপ কষ্টে কিছু ইংরাজি শিখিয়া ঠাকুরদাস প্রথমে মাসিক দুই-টাকা ও তাহার দুইতিনবৎসর পবে মাসিক পাঁচটাকা বেতন উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। অবশেষে জননী দুর্গাদেবী যখন শুনিলেন, তাঁহার ঠাকুবদাসের মাসিক আটটাকা মাহিয়ানা হইয়াছে, তখন তাঁহার আহ্লাদের সীমা রহিল না এবং ঠাকুরদাসের সেই তেইশচব্বিশবৎসর বয়সে গোঘাটনিবাসী রামকান্ত তর্কবাগীশের দ্বিতীয়া কন্যা ভগবতী দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন।

বঙ্গদেশের সৌভাগ্যক্রমে এই ভগবতী দেবী এক অসামান্যা রমণী ছিলেন। শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের রচিত বিদ্যাসাগরগ্রন্থে লিথোগ্রাফপটে এই দেবীমূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়াছে। অধিকাংশ প্রতিমূর্ত্তিই অধিকক্ষণ দেখিবার দরকার হয় না, তাহা যেন মুহূর্ত্তকালের মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়া যায়। তাহা নিপুণ হইতে পারে, সুন্দর হইতে পারে, তথাপি তাহার মধ্যে চিত্তনিবেশের যথোচিত স্থান পাওয়া যায় না, চিত্রপটের উপরিতলেই দৃষ্টির প্রসর পর্য্যবসিত হইয়া যায়। কিন্তু ভগবতী দেবীর এই পবিত্র মুখশ্রীর গভীরতা এবং উদারতা বহুক্ষণ নিরী-

* স্বরচিত বিদ্যাসাগরচরিত, ১৪ পৃষ্ঠা।

ক্ষণ করিয়াও শেষ করিতে পারা যায় না। উন্নত ললাটে তাঁহার বুদ্ধির প্রসার, সুদূরদর্শী স্নেহবর্ষী আয়ত নেত্র, সরল সুগঠিত নাসিকা, দয়াপূর্ণ ওষ্ঠাধর, দৃঢ়তাপূর্ণ চিবুক, এবং সমস্ত মুখের একটি মহিমময় সুসংযত সৌন্দর্য্য দর্শকের হৃদয়কে বহু দূরে এবং বহু উর্দ্ধে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়—এবং ইহাও বুঝিতে পারি, ভক্তিবৃত্তির চরিতার্থতাসাধনের জন্ম কেন বিদ্যাসাগরকে এই মাতৃদেবী ব্যতীত কোনো পৌরাণিক দেবী-প্রতিমার মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয় নাই।

ভগবতী দেবীর অকুণ্ঠিত দয়া তাঁহার গ্রাম, পল্লী, প্রতিবেশীকে নিয়ত অভিষিক্ত করিয়া রাখিত। রোগার্ত্তের সেবা, ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান এবং শোকাতুরের দুঃখে শোকপ্রকাশ করা তাঁহার নিত্যনিয়মিত কার্য্য ছিল। অগ্নিদাহে বীরসিংহগ্রামের বাসস্থান ভস্মীভূত হইয়া গেলে বিদ্যাসাগর যখন তাঁহার জননীদেবীকে কলিকাতায় লইয়া যাইবার চেষ্টা করেন, তিনি বলিলেন, "যে সকল দরিদ্রলোকের সন্তানগণ এখানে ভোজন করিয়া বীরসিংহবিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে, আমি এস্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিলে তাহারা কি খাইয়া স্কুলে অধ্যয়ন করিবে?" *

দয়াবৃত্তি আরো অনেক রমণীর মধ্যে দেখা যায়, কিন্তু ভগবতী দেবীর দয়ার মধ্যে একটি অসাধারণত্ব ছিল, তাহা কোনোপ্রকার সঙ্কীর্ণ সংস্কারের দ্বারা বদ্ধ ছিল না। সাধারণলোকের দয়া দিয়াশেলাই-শলাকার মত কেবল বিশেষরূপ সংঘর্ষেই জ্বলিয়া উঠে এবং তাহা অভ্যাস ও লোকাচারের ক্ষুদ্র বাক্সের মধ্যেই বদ্ধ। কিন্তু ভগবতী দেবীর হৃদয় সূর্য্যের ন্যায় আপনার বুদ্ধি-উজ্জ্বল দয়ারশ্মি স্বভাবতই চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ করিয়া দিত, শাস্ত্র বা প্রথাসংঘর্ষের অপেক্ষা করিত না। বিদ্যাসাগরের তৃতীয়সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহার ভ্রাতার জীবনচরিতে লিখিয়াছেন যে,

* সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত বিদ্যাসাগরজীবনচরিত, ২০০ পৃষ্ঠা।

একবার বিদ্যাসাগর তাঁহার জননীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "বৎসরের মধ্যে একদিন পূজা করিয়া ৬।৭শত টাকা বৃথা ব্যয় করা ভাল, কি গ্রামের নিরুপায় অনাথ লোকদিগকে ঐ টাকা অবস্থানুসারে মাসে মাসে কিছু কিছু সাহায্য করা ভাল?" ইহা শুনিয়া জননীদেবী উত্তর করেন, "গ্রামের দরিদ্র নিরুপায় লোক প্রত্যহ খেতে পাইলে পূজা করিবার আবশ্যক নাই।" এ কথাটি সহজ কথা নহে,—তাঁহার নির্ম্মলবুদ্ধি এবং উজ্জ্বল দয়া প্রাচীন সংস্কারের মোহাবরণ যে এমন অনায়াসে বর্জ্জন করিতে পারে, ইহা আমার নিকট বড় বিস্ময়কর বোধ হয়। লৌকিকপ্রথার বন্ধন রমণীর কাছে যেমন দৃঢ়, এমন আর কার কাছে? অথচ, কি আশ্চর্য্যস্বাভাবিক চিত্তশক্তির দ্বারা তিনি জড়তাময় প্রথাভিত্তি ভেদ করিয়া নিত্যজ্যোতির্ম্ময় অনন্ত বিশ্বধর্ম্মাকাশের মধ্যে উত্তীর্ণ হইলেন। এ কথা তাঁহার কাছে এত সহজ বোধ হইল কি করিয়া যে, মনুষ্যের সেবাই যথার্থ দেবতার পূজা? তাহার কারণ, সকল সংহিতা অপেক্ষা প্রাচীনতম সংহিতা তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত ছিল।

সিবিলিয়ান্ হ্যারিসন্‌সাহেব যখন কার্য্যোপলক্ষ্যে মেদিনীপুরজেলায় গমন করেন, তখন ভগবতী দেবী তাঁহাকে স্বনামে পত্র পাঠাইয়া বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন; তৎসম্বন্ধে তাহার তৃতীয়পুত্র শম্ভুচন্দ্র নিম্নলিখিত বর্ণনা প্রকাশ করিয়াছেন;—"জননীদেবী সাহেবের ভোজনসময়ে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাকে ভোজন করাইয়াছিলেন। তাহাতে সাহেব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন যে, অতি বৃদ্ধা হিন্দুস্ত্রীলোক সাহেবের ভোজনসময়ে চিয়ারে উপবিষ্টা হইয়া কথাবার্ত্তা কহিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ... ... সাহেব হিন্দুর মত জননীকে ভূমিষ্ঠ হইয়া মাতৃভাবে অভিবাদন করেন। তদনন্তর নানা বিষয়ের কথাবার্ত্তা হইল। জননীদেবী প্রবীণ হিন্দুস্ত্রীলোক, তথাপি তাঁহার স্বভাব অতি উদার, মন অতিশয় উন্নত, এবং মনে কিছুমাত্র কুসংস্কার নাই। কি ধনশালী কি দরিদ্র, কি বিদ্বান্

কি মূর্খ, কি উচ্চজাতীয় কি নীচজাতীয়, কি পুরুষ কি স্ত্রী, কি হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী কি অন্যধর্ম্মাবলম্বী, সকলেরই প্রতি সমদৃষ্টি।" *

শম্ভুচন্দ্র অন্যত্র লিখিতেছেন, "১২৬৬ শাল হইতে ৭২ শাল পর্য্যন্ত ক্রমিক বিস্তর বিধবা কামিনীর বিবাহকার্য্য সমাধা হয়। ঐ সকল বিবাহিত লোককে বিপদ্ হইতে রক্ষার জন্য অগ্রজমহাশয় বিশেষরূপ যত্নবান্ ছিলেন। উঁহাদিগকে মধ্যে মধ্যে আপন দেশস্থ ভবনে আনাই-তেন। বিবাহিতা ঐ সকল স্ত্রীলোককে যদি কেহ ঘৃণা করে, এ কারণ জননীদেবী ঐ সকল বিবাহিতা ব্রাহ্মণজাতীয়া স্ত্রীলোকের সহিত একত্র একপাত্রে ভোজন করিতেন।" †

অথচ তখন বিধবাবিবাহের আন্দোলনে দেশের পুরুষেরা বিদ্যা-সাগরের প্রাণসংহারের জন্য গোপনে আয়োজন করিতেছিল, এবং দেশের পণ্ডিতবর্গ শাস্ত্র মন্থন করিয়া কুযুক্তি এবং ভাষা মন্থন করিয়া কটূক্তি বিদ্যাসাগরের মস্তকের উপর বর্ষণ করিতেছিলেন; আর, এই রমণীকে কোনো শাস্ত্রের কোনো শ্লোক খুঁজিতে হয় নাই, বিধাতার স্বহস্তলিখিত শাস্ত্র তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে রাত্রিদিন উদ্‌ঘাটিত ছিল। অভিমন্যু জননী-জঠরে থাকিতে যুদ্ধবিদ্যা শিখিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগরও বিধিলিখিত সেই মহাশাস্ত্র মাতৃগর্ভবাসকালেই অধ্যয়ন করিয়া আসিয়াছিলেন।

আশঙ্কা করিতেছি, সমালোচকমহাশয়েরা মনে করিতে পারেন যে, বিদ্যাসাগরসম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাঁহার জননীসম্বন্ধে এতখানি আলো-চনা কিছু পরিমাণবহির্ভূত হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু এ কথা তাঁহারা স্থির জানিবেন, এখানে জননীর চরিতে এবং পুত্রের চরিতে বিশেষ প্রভেদ নাই, তাঁহারা যেন পরস্পরের পুনরাবৃত্তি। তাহা ছাড়া, মহাপুরুষের

* সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত বিদ্যাসাগরজীবনচরিত, ১৯৯ পৃষ্ঠা।

† সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত বিদ্যাসাগরজীবনচরিত, ১৬৪ পৃষ্ঠা।

ইতিহাস বাহিরের নানা কার্য্যে এবং জীবনবৃত্তান্তে স্থায়ী হয়, আর, মহৎ-নারীর ইতিহাস তাঁহার পুত্রের চরিত্রে, তাঁহার স্বামীর কার্য্যে রচিত হইতে থাকে, এবং সে লেখায় তাঁহার নামোল্লেখ থাকে না। অতএব, বিদ্যা-সাগরের জীবনে তাঁহার মাতার জীবনচরিত কেমন করিয়া লিখিত হইয়াছে, তাহা ভালরূপ আলোচনা না করিলে উভয়েরই জীবনী অসম্পূর্ণ থাকে। আর, আমরা যে মহাত্মার স্মৃতিপ্রতিমাপূজার জন্য এখানে সমবেত হইয়াছি, যদি তিনি কোনোরূপ সূক্ষ্ম চিন্ময় দেহে অদ্য এই সভায় আসনগ্রহণ করিয়া থাকেন, এবং যদি এই অযোগ্য ভক্তকর্ত্তৃক তাঁহার চরিতকীর্ত্তন তাঁহার শ্রুতিগোচর হয়, তবে এই রচনার যে অংশে তাঁহার জীবনী অবলম্বন করিয়া তাঁহার মাতৃদেবীর মাহাত্ম্য মহীয়ান্ হইয়াছে, সেইখানেই তাঁহার দিব্যনেত্র হইতে প্রভূততম পুণ্যাশ্রুবর্ষণ হইতে থাকিবে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

বিদ্যাসাগর তাঁহার বর্ণপরিচয় প্রথমভাগে গোপালনামক একটি সুবোধ ছেলের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহাকে বাপমায়ে যাহা বলে, সে তাহাই করে। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র নিজে যখন সেই গোপালের বয়সী ছিলেন, তখন গোপালের অপেক্ষা কোনো কোনো অংশে রাখালের সঙ্গেই তাঁহার অধিকতর সাদৃশ্য দেখা যাইত। পিতার কথা পালন করা দূরে থাক্, পিতা যাহা বলিতেন, তিনি ঠিক তাহার উল্টা করিয়া বসিতেন। শম্ভু-চন্দ্র লিখিয়াছেন—"পিতা তাঁহার স্বভাব বুঝিয়া চলিতেন। যেদিন শাদাবস্ত্র না থাকিত, সেদিন বলিতেন, আজ ভাল কাপড় পরিয়া কালেজে যাইতে হইবে, তিনি হঠাৎ বলিতেন, না, আজ ময়লা কাপড় পরিয়া যাইব। যেদিন বলিতেন, আজ স্নান করিতে হইবে, শ্রবণমাত্র দাদা বলি-তেন যে, আজ স্নান করিব না; পিতা প্রহার করিয়াও স্নান করাইতে পারিতেন না। সঙ্গে করিয়া টাঁ্যাকশালের ঘাটে নামাইয়া দিলেও

দাঁড়াইয়া থাকিতেন। পিতা চড়চাপড় মারিয়া জোর করিয়া স্নান করাইতেন।" *

পাঁচছয়বৎসর বয়সের সময় যখন গ্রামের পাঠশালায় পড়িতে যাইতেন, তখন প্রতিবেশী মথুরমণ্ডলের স্ত্রীকে রাগাইয়া দিবার জন্য যে প্রকার সভ্যবিগর্হিত উপদ্রব তিনি করিতেন, বর্ণপরিচয়ের সর্ব্বজননিন্দিত রাখাল-বেচারাও বোধ করি এমন কাজ কখনো করে নাই।

নিরীহ বাংলাদেশে গোপালের মত সুবোধছেলের অভাব নাই। এই ক্ষীণতেজ দেশে রাখাল এবং তাহার জীবনীলেখক ঈশ্বরচন্দ্রের মত দুর্দ্দান্ত ছেলের প্রাদুর্ভাব হইলে বাঙালীজাতির শীর্ণচরিত্রের অপবাদ ঘুচিয়া যাইতে পারে। সুবোধ ছেলেগুলি পাস্ করিয়া ভাল চাকৃরিবাকৃরি ও বিবাহকালে প্রচুর পণ লাভ করে, সন্দেহ নাই, কিন্তু দুষ্ট অবাধ্য-অশান্ত ছেলেগুলির কাছে স্বদেশের জন্য অনেক আশা করা যায়। বহুকাল পূর্ব্বে একদা নবদ্বীপের শচীমাতার এক প্রবল দুরন্ত-ছেলে এই আশা পূর্ণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু একটা বিষয়ে রাখালের সহিত তাহার জীবনচরিতলেখকের সাদৃশ্য ছিল না। "রাখাল পড়িতে যাইবার সময় পথে খেলা করে, মিছামিছি দেরি করিয়া, সকলের শেষে পাঠশালায় যায়।" কিন্তু পড়াশুনায় বালক ঈশ্বরচন্দ্রের কিছুমাত্র শৈথিল্য ছিল না। যে প্রবল জিদের সহিত তিনি পিতার আদেশ ও নিষেধের বিপরীত কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, সেই দুর্দ্দম জিদের সহিত তিনি পড়িতে যাইতেন। সেও তাঁহার প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে নিজের জিদ্‌রক্ষা। ক্ষুদ্র একগুঁয়ে ছেলেটি মাথায় এক মস্ত ছাতা তুলিয়া তাঁহাদের বড়বাজারের বাসা হইতে পটলডাঙায় সংস্কৃতকালেজে যাত্রা করিতেন, লোকে মনে করিত, একটা ছাতা চলিয়া যাইতেছে। এই দুর্জ্জয় বালকের শরীরটি খর্ব্ব, শীর্ণ,

* সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত বিদ্যাসাগরজীবনচরিত, ২৫ পৃষ্ঠা।

মাথাটা প্রকাণ্ড,—স্কুলের ছেলেরা সেইজন্য তাঁহাকে যশুরে কৈ ও তাহার অপভ্রংশে কসুরে জৈ বলিয়া ক্ষ্যাপাইত, তিনি তখন তোৎলা ছিলেন, রাগিয়া কথা কহিতে পারিতেন না।*

এই বালক রাত্রি দশটার সময় শুইতে যাইতেন। পিতাকে বলিয়া যাইতেন, রাত্রি দুইপ্রহরের সময় তাঁহাকে জাগাইয়া দিতে। পিতা আর্ম্মাণিগির্জ্জার ঘড়িতে বারোটা বাজিলেই ঈশ্বরচন্দ্রকে জাগাইতেন, বালক অবশিষ্ট রাত্রি জাগিয়া পড়া করিতেন। ইহাও একগুঁয়ে ছেলের নিজের শরীরের প্রতি জিদ্। শরীরও তাহার প্রতিশোধ তুলিতে ছাড়িত না। মাঝে মাঝে কঠিন সাংঘাতিক পীড়া হইয়াছিল, কিন্তু পীড়ার শাসনে তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারে নাই।

ইহার উপরে গৃহকর্ম্মও অনেক ছিল। বাসায় তাঁহার পিতা ও মধ্যমভ্রাতা ছিলেন। দাসদাসী ছিল না। ঈশ্বরচন্দ্র দুইবেলা সকলের রন্ধনাদি কার্য্য করিতেন। সহোদর শম্ভুচন্দ্র তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গ হইলে ঈশ্বরচন্দ্র কিয়ৎক্ষণ পুস্তক আবৃত্তি করিয়া গঙ্গার ঘাটে স্নান করিয়া কাশীনাথবাবুর বাজারে বাটামাছ ও আলুপটল-তরকারী ক্রয় করিয়া আনিতেন। বাট্‌না বাটিয়া উনান্ ধরাইয়া রন্ধন করিতেন। বাসায় তাঁহারা চারিজন খাইতেন। আহারের পর উচ্ছিষ্ট মুক্ত ও বাসন ধৌত করিয়া তবে পড়িতে যাইবার অবসর পাইতেন। পাক করিতে করিতে ও স্কুলে যাইবার সময় পথে চলিতে চলিতে পাঠানুশীলন করিতেন।

এই ত অবস্থা। এদিকে ছুটির সময় যখন জল খাইতে যাইতেন, তখন স্কুলের ছাত্র যাহারা উপস্থিত থাকিত, তাহাদিগকে মিষ্টান্ন খাওয়াইতেন। স্কুল হইতে মাসিক যে বৃত্তি পাইতেন, ইহাতেই তাহা ব্যয় হইত। আবার, দরোয়ানের নিকট ধার করিয়া দরিদ্র ছাত্রদিগকে

* সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত বিদ্যাসাগরজীবনচরিত।

নূতন বস্ত্র কিনিয়া দিতেন। পূজার ছুটির পর দেশে গিয়া "দেশস্থ যে সকল লোকের দিনপাত হওয়া দুষ্কর দেখিতেন, তাহাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে ক্ষান্ত থাকিতেন না। অন্যান্য লোকের পরিধেয়বস্ত্র না থাকিলে, গামছা পরিধান করিয়া নিজের বস্ত্রগুলি তাহাদিগকে বিতরণ করিতেন।" *

যে অবস্থায় মানুষ নিজের নিকট নিজে প্রধান দয়ার পাত্র, সে অবস্থায় ঈশ্বরচন্দ্র অন্যকে দয়া করিয়াছেন। তাঁহার জীবনে প্রথম হইতে ইহাই দেখা যায় যে, তাঁহার চরিত্র সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে ক্রমাগতই যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিয়াছে। তাঁহার মত অবস্থাপন্ন ছাত্রের পক্ষে বিদ্যালাভ করা পরম দুঃসাধ্য, কিন্তু এই গ্রাম্যবালক শীর্ণ খর্ব্বদেহ এবং প্রকাণ্ড মাথা লইয়া আশ্চর্য্য অল্পকালের মধ্যেই বিদ্যাসাগর-উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার মত দরিদ্রাবস্থার লোকের পক্ষে দান করা, দয়া করা বড় কঠিন, কিন্তু তিনি যখন যে অবস্থাতেই পড়িয়াছেন, নিজের কোনোপ্রকার অসচ্ছলতায় তাঁহাকে পরের উপকার হইতে বিরত করিতে পারে নাই, এবং অনেক মহৈশ্বর্য্যশালী রাজা-রায়বাহাদুর প্রচুর ক্ষমতা লইয়া যে উপাধি লাভ করিতে পারে নাই, এই দরিদ্র পিতার দরিদ্র সন্তান সেই 'দয়ার সাগর' নামে বঙ্গদেশে চিরদিনের জন্য বিখ্যাত হইয়া রহিলেন।

কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যাসাগর প্রথমে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিত ও পরে সংস্কৃতকলেজের অ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারির পদে নিযুক্ত হন। এই কার্য্যোপলক্ষ্যে তিনি যে সকল ইংরাজ প্রধান-কর্ম্মচারীদের সংস্রবে আসিয়াছিলেন, সকলেরই পরম শ্রদ্ধা ও প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। আমাদের দেশে প্রায় অনেকেই নিজের এবং স্বদেশের মর্য্যাদা নষ্ট করিয়া ইংরাজের অনুগ্রহ লাভ করেন। কিন্তু

* সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত বিদ্যাসাগরজীবনচরিত, ৩৭ পৃষ্ঠা।

বিদ্যাসাগর সাহেবের হস্ত হইতে শিরোপা লইবার জন্য কখনো মাথা নত করেন নাই; তিনি আমাদের দেশের ইংরাজপ্রসাদগর্ব্বিত সাহেবানুজীবীদের মত আত্মাবমাননার মূল্যে বিক্রীত সম্মান ক্রয় করিতে চেষ্টা করেন নাই। একটা উদাহরণে তাহার প্রমাণ হইবে।—একবার তিনি কার্য্যোপলক্ষ্যে হিন্দুকলেজের প্রিন্সিপল্ কার্-সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। সভ্যতাভিমানী সাহেব তাঁহার বুট্-বেষ্টিত দুই পা টেবিলের উপরে উর্দ্ধগামী করিয়া দিয়া বাঙালী ভদ্রলোকের সহিত ভদ্রতারক্ষা করা বাহুল্য বোধ করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে ঐ কার্সাহেব কার্য্যবশত সংস্কৃতকলেজে বিদ্যাসাগরের সহিত দেখা করিতে আসিলে বিদ্যাসাগর চটিজুতাসমেত তাঁহার সর্ব্বজনবন্দনীয় চরণযুগল টেবিলের উপর প্রসারিত করিয়া এই অহঙ্কৃত ইংরাজ অভ্যাগতের সহিত আলাপ করিলেন। বোধ করি শুনিয়া কেহ বিস্মিত হইবেন না, সাহেব নিজের এই অবিকল অনুকরণ দেখিয়া সন্তোষলাভ করেন নাই।

ইতিমধ্যে কলেজের কার্য্যপ্রণালীসম্বন্ধে তাঁহার সহিত কর্ত্তৃপক্ষের মতান্তর হওয়ায় ঈশ্বরচন্দ্র কর্ম্মত্যাগ করিলেন। সম্পাদক রসময় দত্ত এবং শিক্ষাসমাজের অধ্যক্ষ ময়েট্সাহেব অনেক উপরোধ-অনুরোধ করিয়াও কিছুতেই তাঁহার পণ ভঙ্গ করিতে পারিলেন না। আত্মীয়-বান্ধবেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার চলিবে কি করিয়া? তিনি বলিলেন, আলুপটল বেচিয়া, মুদির দোকান করিয়া দিন চালাইব। তখন বাসায় প্রায় কুড়িটি বালককে তিনি অন্নবস্ত্র দিয়া অধ্যয়ন করাইতেছিলেন—তাহাদের কাহাকেও বিদায় করিলেন না। তাঁহার পিতা পূর্ব্বে চাকরি করিতেন—বিদ্যাসাগরের সবিশেষ অনুরোধে কার্য্যত্যাগ করিয়া বাড়ী বসিয়া সংসারখরচের টাকা পাইতেছিলেন। বিদ্যাসাগর কাজ ছাড়িয়া দিয়া প্রতিমাসে ধার করিয়া পঞ্চাশটাকা বাড়ী পাঠাইতে লাগিলেন।

এইসময় ময়েট্‌সাহেবের অনুরোধে বিদ্যাসাগর কাপ্তেন্‌-ব্যাঙ্ক-নামক একজন ইংরাজকে কয়েকমাস বাংলা ও হিন্দী শিখাইতেন। সাহেব যখন মাসিক পঞ্চাশটাকা হিসাবে বেতন দিতে গেলেন, তিনি বলিলেন, আপনি ময়েট্‌সাহেবের বন্ধু এবং ময়েট্‌সাহেব আমার বন্ধু—আপনার কাছে আমি বেতন লইতে পারি না।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর সংস্কৃতকলেজের সাহিত্য-অধ্যাপক ও ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে উক্ত কলেজের প্রিন্সিপল্‌ পদে নিযুক্ত হন। আটবৎসর দক্ষতার সহিত কাজ করিয়া শিক্ষাবিভাগের নবীন কর্ত্তা এক তরুণ সিবিলিয়ানের সহিত মনান্তর হইতে থাকায় ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে তিনি কর্ম্ম-ত্যাগ করেন। বিদ্যাসাগর স্বভাবতই সম্পূর্ণ স্বাধীনতন্ত্রের লোক ছিলেন; অব্যাহতভাবে আপন ইচ্ছা চালনা করিতে পাইলে তবে তিনি কাজ করিতে পারিতেন; উপরিতন কর্ত্তৃপক্ষের মতের দ্বারা কোনরূপ প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইলে তদনুসারে আপন সঙ্কল্পের প্রবাহ তিলমাত্র পরিবর্ত্তন করিতে পারিতেন না। কর্ম্মনীতির নিয়মে ইহা তাঁহার পক্ষে প্রশংসনীয় ছিল না, কিন্তু বিধাতা তাঁহাকে একাধিপত্য করিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন; অধীনে কাজ চালাইবার গুণগুলি তাঁহাকে দেন নাই। উপযুক্ত অধীনস্থ কর্ম্মচারী বাংলাদেশে যথেষ্ট আছে,—বিদ্যা-সাগরকে দিয়া তাহাদের সংখ্যাবৃদ্ধি করা বিধাতা অনাবশ্যক ও অসঙ্গত বোধ করিয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃতকলেজে নিযুক্ত, তখন কলেজের কাজকর্ম্মের মধ্যে থাকিয়াও এক প্রচণ্ড সমাজসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। একদিন বীরসিংহবাটীর চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার পিতার সহিত বীরসিংহস্কুলসম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন, এমন-সময় তাঁহার মাতা রোদন করিতে করিতে চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া একটি বালিকার বৈধব্য-সংঘটনের উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, তুই এতদিন এত শাস্ত্র

পড়িলি, তাহাতে বিধবার কি কোনো উপায় নাই? * মাতার পুত্র উপায়-অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন।

স্ত্রীজাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের বিশেষ স্নেহ অথচ ভক্তি ছিল। ইহাও তাঁহার সুমহৎ-পৌরুষের একটি প্রধান লক্ষণ। সাধারণত আমরা স্ত্রীজাতির প্রতি ঈর্ষাবিশিষ্ট; অবলা স্ত্রীলোকের সুখ-স্বাস্থ্য-স্বচ্ছন্দতা আমাদের নিকট পরম পরিহাসের বিষয়, প্রহসনের উপকরণ। আমাদের ক্ষুদ্রতা ও কাপুরুষতার অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে ইহাও একটি।

বিদ্যাসাগর শৈশবে জগদ্দুর্লভবাবুর বাসায় আশ্রয় পাইয়াছিলেন। জগদ্দুর্লভের কনিষ্ঠা ভগিনী রাইমণির সম্বন্ধে তিনি স্বরচিত জীবনবৃত্তান্তে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। "রাইমণির অদ্ভুত স্নেহ ও যত্ন আমি কস্মিন্‌কালেও বিস্মৃত হইতে পারিব না। তাঁহার একমাত্র পুত্র গোপালচন্দ্র ঘোষ আমার প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন। পুত্রের উপর জননীর যেরূপ স্নেহ ও যত্ন থাকা উচিত ও আবশ্যক, গোপালচন্দ্রের উপর রাইমণির স্নেহ ও যত্ন তদপেক্ষা অধিকতর ছিল, তাহার সংশয় নাই। কিন্তু আমার আন্তরিক দৃঢ়বিশ্বাস এই যে, স্নেহ ও যত্নবিষয়ে আমায় ও গোপালে রাইমণির অণুমাত্র বিভিন্নভাব ছিল না। ফল কথা এই, স্নেহ, দয়া, সৌজন্য, অমায়িকতা, সদ্বিবেচনা প্রভৃতি সদ্‌গুণবিষয়ে, রাইমণির সমকক্ষ স্ত্রীলোক এ পর্য্যন্ত আমার নয়নগোচর হয় নাই। এই দয়াময়ীর সৌম্যমূর্ত্তি আমার হৃদয়মন্দিরে দেবীমূর্ত্তির ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিরাজমান রহিয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার কথা উত্থাপিত হইলে তদীয় অপ্রতিমগুণের কীর্ত্তন করিতে করিতে অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারি না। আমি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী বলিয়া অনেকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আমার বোধ হয়, সে নির্দ্দেশ অসঙ্গত নহে। যে ব্যক্তি রাইমণির স্নেহ, দয়া, সৌজন্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং ঐ সমস্ত

* সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত বিদ্যাসাগরজীবনচরিত, ১১০ পৃষ্ঠা।

সদ্‌গুণের ফলভোগী হইয়াছে, সে যদি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী না হয়, তাহা হইলে, তাহার তুল্য কৃতঘ্ন পামর ভূমণ্ডলে নাই।"

স্ত্রীজাতির স্নেহ-দয়া-সৌজন্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, আমাদের মধ্যে এমন হতভাগ্য কয়জন আছে? কিন্তু ক্ষুদ্র হৃদয়ের স্বভাব এই যে, সে যে পরিমাণে অযাচিত উপকার প্রাপ্ত হয়, সেই পরিমাণে অকৃতজ্ঞ হইয়া উঠে। যাহা-কিছু সহজেই পায়, তাহাই আপনার প্রাপ্য বলিয়া জানে; নিজের দিক্ হইতে যে কিছুমাত্র দেয় আছে, তাহা সহজেই ভুলিয়া যায়। আমরাও সংসারে মাঝে মাঝে রাইমণিকে দেখিতে পাই;—এবং তিনি যখন সেবা করিতে আসেন, তখন তাঁহার সমস্ত যত্ন এবং প্রীতি অবহেলাভরে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে পরম অনুগ্রহ করিয়া থাকি;—তিনি যখন চরণপূজা করিতে আসেন, তখন আপন পঙ্ক-কলঙ্কিত পদযুগল অসঙ্কোচে প্রসারিত করিয়া দিয়া অত্যন্ত নির্লজ্জ স্পর্দ্ধা-ভরে সত্যসত্যই আপনাদিগকে নরদেবতারূপে নারীসম্প্রদায়ের পূজা-গ্রহণের অধিকারী বলিয়া জ্ঞান করি। কিন্তু এই সকল সেবক-পূজক অবলাগণের দুঃখমোচন এবং সুখস্বাস্থ্যবিধানে আমাদের মত মর্ত্ত্য-দেবগণের সুমহৎ ঔদাসীন্য কিছুতেই দূর হয় না; তাহার কারণ, নারীদের কৃত সেবা কেবল আমরা আমাদের সাংসারিক স্বার্থসুখের সহিত জড়িত করিয়া দেখি, তাহা আমাদের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কৃতজ্ঞতা উদ্রেক করিবার অবকাশ পায় না।

বিদ্যাসাগর প্রথমত বেথুন্‌সাহেবের সহায়তা করিয়া বঙ্গদেশে স্ত্রী-শিক্ষার সূচনা ও বিস্তার করিয়া দেন। অবশেষে যখন তিনি বালবিধবা-দের দুঃখে ব্যথিত হইয়া বিধবাবিবাহপ্রচলনের চেষ্টা করেন, তখন দেশের মধ্যে সংস্কৃতশ্লোক ও বাংলা গালি মিশ্রিত এক তুমুল কল-কোলাহল উত্থিত হইল। সেই মুষলধারে শাস্ত্র ও গালিবর্ষণের মধ্যে এই

ব্রাহ্মণবীর বিজয়ী হইয়া বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত প্রমাণ করিলেন এবং তাহা রাজবিধিসম্মত করিয়া লইলেন।

বিদ্যাসাগর এই সময়ে আরো একটি ক্ষুদ্র সামাজিক যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন, এস্থলে তাহারও সংক্ষেপে উল্লেখ আবশ্যক। তখন সংস্কৃত-কলেজে কেবল ব্রাহ্মণেরই প্রবেশ ছিল, সেখানে শূদ্রেরা সংস্কৃত পড়িতে পাইত না। বিদ্যাসাগর সকল বাধা অতিক্রম করিয়া শূদ্রদিগকে সংস্কৃত-কলেজে বিদ্যাশিক্ষার অধিকার দান করেন।

সংস্কৃতকলেজের কর্ম্ম ছাড়িয়া দিবার পর বিদ্যাসাগরের প্রধান-কীর্ত্তি মেট্রোপলিটান্ ইনষ্টিট্যুশন্। বাঙালীর নিজের চেষ্টায় এবং নিজের অধীনে উচ্চতর শিক্ষার কলেজস্থাপন এই প্রথম। আমাদের দেশে ইংরাজিশিক্ষাকে স্বাধীনভাবে স্থায়ী করিবার এই প্রথম ভিত্তি বিদ্যাসাগরকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইল। যিনি দরিদ্র ছিলেন, তিনি দেশের প্রধান দাতা হইলেন; যিনি লোকাচাররক্ষক ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি লোকাচারের একটি সুদৃঢ় বন্ধন হইতে সমাজকে মুক্ত করিবার জন্য সুকঠোর সংগ্রাম করিলেন, এবং সংস্কৃতবিদ্যায় যাঁহার অধিকারের ইয়ত্তা ছিল না, তিনিই ইংরাজিবিদ্যাকে প্রকৃতপ্রস্তাবে স্বদেশের ক্ষেত্রে বদ্ধমূল করিয়া রোপণ করিয়া গেলেন।

বিদ্যাসাগর তাঁহার জীবনের অবশিষ্টকাল এই স্কুল ও কলেজটিকে একাগ্রচিত্তে প্রাণাধিকযত্নে পালন করিয়া, দীনদরিদ্র রোগীর সেবা করিয়া, অকৃতজ্ঞদিগকে মার্জ্জনা করিয়া, বন্ধুবান্ধবদিগকে অপরিমেয় স্নেহে অভিষিক্ত করিয়া, আপন পুষ্পকোমল এবং বজ্রকঠিন বক্ষে দুঃসহ বেদনাশল্য বহন করিয়া, আপন আত্মনির্ভরপর উন্নত-বলিষ্ঠ চরিত্রের মহান্ আদর্শ বাঙালীজাতির মনে চিরাঙ্কিত করিয়া দিয়া ১২৯৮ সালের ১৩ই শ্রাবণ রাত্রে ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়া গেলেন।

বিদ্যাসাগর বঙ্গদেশে তাঁহার অক্ষয় দয়ার জন্য বিখ্যাত। কারণ,

দয়াবৃত্তি আমাদের অশ্রুপাতপ্রবণ বাঙালীহৃদয়কে যত শীঘ্র প্রশংসায় বিচলিত করিতে পারে, এমন আর কিছুই নহে। কিন্তু বিদ্যাসাগরের দয়ায় কেবল যে বাঙালীজনসুলভ হৃদয়ের কোমলতা প্রকাশ পায়, তাহা নহে, তাহাতে বাঙালীদুর্লভ চরিত্রের বলশালিতারও পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার দয়া কেবল একটা প্রবৃত্তির ক্ষণিক উত্তেজনামাত্র নহে, তাহার মধ্যে একটা সচেষ্ট আত্মশক্তির অচলকর্তৃত্ব সর্ব্বদা বিরাজ করিত বলিয়াই তাহা এমন মহিমশালিনী। এ দয়া অন্যের কষ্টলাঘবের চেষ্টায় আপনাকে কঠিন কষ্টে ফেলিতে মুহূর্ত্তকালের জন্য কুণ্ঠিত হইত না। সংস্কৃতকলেজে কাজ করিবার সময় ব্যাকরণ-অধ্যাপকের পদ শূন্য হইলে বিদ্যাসাগর তারানাথ তর্কবাচস্পতির জন্য মার্শাল্‌সাহেবকে অনুরোধ করেন। সাহেব বলিলেন, তাঁহার চাকরি লইবার ইচ্ছা আছে কি না, অগ্রে জানা আবশ্যক। শুনিয়া বিদ্যাসাগর সেইদিনেই ত্রিশক্রোশ পথ দূরে কালনায় তর্কবাচস্পতির চতুষ্পাঠী-অভিমুখে পদব্রজে যাত্রা করিলেন। পরদিনে তর্কবাচস্পতির সম্মতি ও তাঁহার প্রশংসাপত্রগুলি লইয়া পুনরায় পদব্রজে যথাসময়ে সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলেন।* পরের উপকারকার্য্যে তিনি আপনার সমস্ত বল ও উৎসাহ প্রয়োগ করিতেন। ইহার মধ্যেও তাঁহার আজন্মকালের একটা জিদ্‌ প্রকাশ পাইত। সাধারণত আমাদের দয়ার মধ্যে এই জিদ্‌ না থাকাতে তাহা সঙ্কীর্ণ ও স্বল্পফলপ্রসূ হইয়া বিশীর্ণ হইয়া যায়, তাহা পৌরুষমহত্ত্ব লাভ করে না।

কারণ, দয়া বিশেষরূপে স্ত্রীলোকের নহে; প্রকৃত দয়া যথার্থ পুরুষেরই ধর্ম্ম। দয়ার বিধান পূর্ণরূপে পালন করিতে হইলে দৃঢ় বীর্য্য এবং কঠিন অধ্যবসায় আবশ্যক, তাহাতে অনেকসময় সুদূরব্যাপী সুদীর্ঘ কর্ম্মপ্রণালী অনুসরণ করিয়া চলিতে হয়; তাহা কেবল ক্ষণকালের

* সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত বিদ্যাসাগরজীবনচরিত।

আত্মত্যাগের দ্বারা প্রবৃত্তির উচ্ছ্বাসনিবৃত্তি এবং হৃদয়ের ভারলাঘব করা নহে; তাহা দীর্ঘকাল ধরিয়া নানা উপায়ে নানা বাধা অতিক্রম করিয়া দুরূহ উদ্দেশ্যসিদ্ধির অপেক্ষা রাখে।

একবার গবর্মেণ্টের কোন অত্যুৎসাহী ভৃত্য জাহানাবাদ-মহকুমায় ইন্‌কম্‌ট্যাক্স ধার্য্যের জন্য উপস্থিত হন। আয়ের স্বল্পতাপ্রযুক্ত যে সকল ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ইন্‌কম্‌ট্যাক্সের অধীনে না আসিতে পারে, গবর্মেণ্টের এই সুচতুর শিকারী তাহাদের দুইতিনজনের নাম একত্র করিয়া ট্যাক্সের জালে বদ্ধ করিতেছিলেন। বিদ্যাসাগর ইহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ খড়ার-গ্রামে অ্যাসেসর্‌বাবুর নিকটে আসিয়া আপত্তিপ্রকাশ করেন। বাবুটি তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া অভিযোগকারীদিগকে ধমক দিয়া বাধ্য করিলেন। বিদ্যাসাগর তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় আসিয়া লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরের নিকট বাদী হইলেন। লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর বর্দ্ধমানের কালেক্টর হ্যারিসন্‌সাহেবকে তদন্তজন্য প্রেরণ করেন। বিদ্যাসাগর হ্যারিসনের সঙ্গে গ্রামে গ্রামে ব্যবসায়ীদের খাতাপত্র পরীক্ষা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন—এইরূপে দুইমাসকাল অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া তিনি এই অন্যায়-নিবারণে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগরের জীবনে এরূপ দৃষ্টান্ত আরো অনেক দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এরূপ দৃষ্টান্ত বাংলায় অন্যত্র হইতে সংগ্রহ করা দুষ্কর। আমাদের হৃদয় অত্যন্ত কোমল বলিয়া আমরা প্রচার করিয়া থাকি, কিন্তু আমরা কোনো ঝঞ্ঝটে যাইতে চাহি না। এই অলস শান্তিপ্রিয়তা আমাদিগকে অনেক সময়েই স্বার্থপর নিষ্ঠুরতায় অবতীর্ণ করে। একজন জাহাজীগোরা কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া মজ্জমান ব্যক্তির পশ্চাতে জলে ঝাঁপ দিয়া পড়ে; কিন্তু একখানা নৌকা যেখানে বিপন্ন, অন্য নৌকাগুলি তাহার কিছুমাত্র সাহায্যচেষ্টা না করিয়া চলিয়া যায়, এরূপ ঘটনা আমা-

* সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত বিদ্যাসাগরজীবনচরিত।

দের দেশে সর্ব্বদাই শুনিতে পাই। দয়ার সহিত বীর্য্যের সম্মিলন না হইলে সে দয়া অনেকস্থলেই অকিঞ্চিৎকর হইয়া থাকে।

কেবল যে সঙ্কট এবং অধ্যবসায়ের ক্ষেত্রে আমাদের অন্তঃপুরচারিণী দয়া প্রবেশ করিতে চাহে না, তাহা নহে। সামাজিক কৃত্রিম শুচিতারক্ষার নিয়মলঙ্ঘনও তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য। আমি জানি, কোন এক গ্রাম্য-মেলায় এক বিদেশী ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইলে ঘৃণা করিয়া কেহই তাহার অন্ত্যেষ্টিসৎকারের ব্যবস্থা করে নাই, অবশেষে তাহার অনুপস্থিত আত্মীয়-পরিজনের অন্তরে চিরশোকশল্য নিহিত করিয়া ডোমের দ্বারা মৃতদেহ শ্মশানে শৃগালকুক্কুরের মুখে ফেলিয়া আসা হয়। আমরা অতি সহজেই 'আহা উহু' এবং অশ্রুপাত করিতে পারি, কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে পরোপকারের পথে আমরা সহস্র স্বাভাবিক এবং কৃত্রিম বাধার দ্বারা পদে পদে প্রতিহত। বিদ্যাসাগরের কারুণ্য বলিষ্ঠ,—পুরুষোচিত; এইজন্য তাহা সরল এবং নির্ব্বিকার; তাহা কোথাও সূক্ষ্মতর্ক তুলিত না, নাসিকা-কুঞ্চন করিত না, বসন তুলিয়া ধরিত না; একেবারে দ্রুতপদে, ঋজু-রেখায়, নিঃশঙ্কে, নিঃসঙ্কোচে আপন কার্য্যে গিয়া প্রবৃত্ত হইত। রোগের বীভৎস মলিনতা তাঁহাকে কখন রোগীর নিকট হইতে দূরে রাখে নাই। এমন কি, (চণ্ডীচরণবাবুর গ্রন্থে লিখিত আছে) ধর্ম্মাটাড়ে এক মেথর-জাতীয় স্ত্রীলোক ওলাউঠায় আক্রান্ত হইলে বিদ্যাসাগর স্বয়ং তাহার কুটীরে উপস্থিত থাকিয়া স্বহস্তে তাহার সেবা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। বর্দ্ধমানবাসকালে তিনি তাঁহার প্রতিবেশী দরিদ্র মুসলমানগণকে আত্মীয়-নির্ব্বিশেষে যত্ন করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহার সহোদরের জীবনচরিতে লিখিতেছেন—"অন্নছত্রে ভোজনকারিণী স্ত্রীলোকদের মস্তকের কেশগুলি তৈলাভাবে বিরূপ দেখাইত। অগ্রজ-মহাশয় তাহা অবলোকন করিয়া দুঃখিত হইয়া তৈলের ব্যবস্থা করিয়া-ছিলেন। প্রত্যেককে দুইপলা করিয়া তৈল দেওয়া হইত। যাহারা

তৈল বিতরণ করিত, তাহারা, পাছে মুচি, হাড়ি, ডোম প্রভৃতি অপকৃষ্ট-জাতীয় স্ত্রীলোক স্পর্শ করে, এই আশঙ্কায় তফাৎ হইতে তৈল দিত, ইহা দেখিয়া অগ্রজমহাশয় স্বয়ং উক্ত অপকৃষ্ট ও অস্পৃশ্য জাতীয় স্ত্রীলোকদের মাথায় তৈল মাখাইয়া দিতেন।”

এই ঘটনাশ্রবণে আমাদের হৃদয় যে ভক্তিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, তাহা বিদ্যাসাগরের দয়া অনুভব করিয়া নহে—কিন্তু তাঁহার দয়ার মধ্য হইতে যে একটি নিঃসঙ্কোচ বলিষ্ঠ মনুষ্যত্ব পরিস্ফুট হইয়া উঠে, তাহা দেখিয়া আমাদের এই নীচজাতির প্রতি চিরাভ্যস্ত ঘৃণাপ্রবণ মনও আপন নিগূঢ় মানবধর্ম্মবশত ভক্তিতে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না।

তাঁহার কারুণ্যের মধ্যে যে পৌরুষের লক্ষণ ছিল, তাহার অনেক উদাহরণ দেখা যায়। আমাদের দেশে আমরা যাঁহাদিগকে ভালমানুষ অমায়িকপ্রকৃতি বলিয়া প্রশংসা করি, সাধারণত তাঁহাদের চক্ষুলজ্জা বেশি। অর্থাৎ কর্ত্তব্যস্থলে তাঁহারা কাহাকেও বেদনা দিতে পারেন না। বিদ্যাসাগরের দয়ায় সেই কাপুরুষতা ছিল না। ঈশ্বরচন্দ্র যখন কলেজের ছাত্র ছিলেন, তখন তাঁহাদের বেদান্ত-অধ্যাপক শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতির সহিত তাঁহার বিশেষ প্রীতিবন্ধন ছিল। বাচস্পতিমহাশয় বৃদ্ধবয়সে পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবার ইচ্ছা করিয়া তাঁহার প্রিয়তম ছাত্রের মত জিজ্ঞাসা করিলে ঈশ্বরচন্দ্র প্রবল আপত্তিপ্রকাশ করিলেন। গুরু বারংবার কাকুতিমিনতি করা সত্ত্বেও তিনি মত পরিবর্ত্তন করিলেন না। তখন বাচস্পতিমহাশয় ঈশ্বরচন্দ্রের নিষেধে কর্ণপাত না করিয়া এক সুন্দরী বালিকাকে বিবাহপূর্ব্বক তাহাকে আশু বৈধব্যের তটদেশে আনয়ন করিলেন। শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার বিদ্যাসাগর-গ্রন্থে এই ব্যাপারের যে পরিণাম বর্ণন করিয়াছেন, তাহা এই-স্থলে উদ্ধৃত করি।

"বাচস্পতিমহাশয় ঈশ্বরচন্দ্রের হাত ধরিয়া বলিলেন, 'তোমার মাকে দেখিয়া যাও'। এই বলিয়া দাসীকে নববধূর অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিতে বলিলেন। তখন বাচস্পতিমহাশয়ের নববিবাহিতা পত্নীকে দেখিয়া ঈশ্বরচন্দ্র অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না। সেই জননীস্থানীয়া বালিকাকে দর্শন করিয়া ও এই বালিকার পরিণাম চিন্তা করিয়া বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। তখন বাচস্পতিমহাশয় 'অকল্যাণ করিস্ না রে' বলিয়া তাঁহাকে লইয়া বাহিরবাটীতে আসিলেন এবং নানাপ্রকার শাস্ত্রীয় উপদেশের দ্বারা ঈশ্বরচন্দ্রের মনের উত্তেজনা ও হৃদয়ের আবেগ রোধ করিতে ও তাঁহাকে শান্ত করিতে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। এইরূপ বহুবিধ প্রবোধবাক্যে শান্ত করিতে প্রয়াস পাইয়া শেষে ঈশ্বরচন্দ্রকে কিঞ্চিৎ জল খাইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু পাষাণ-তুল্য-কঠিনপ্রতিজ্ঞা-পরায়ণ ঈশ্বরচন্দ্র জলযোগ করিতে সম্পূর্ণরূপে অসম্মত হইয়া বলিলেন, 'এ ভিটায় আর কখনও জলস্পর্শ করিব না'।"

বিদ্যাসাগরের হৃদয়বৃত্তির মধ্যে যে বলিষ্ঠতা দেখা যায়, তাঁহার বুদ্ধি-বৃত্তির মধ্যেও তাহার পরিপূর্ণ প্রভাব প্রকাশ পায়। বাঙালীর বুদ্ধি সহজেই অত্যন্ত সূক্ষ্ম। তাহার দ্বারা চুল চেরা যায়, কিন্তু বড় বড় গ্রন্থি ছেদন করা যায় না। তাহা সুনিপুণ, কিন্তু সবল নহে। আমাদের বুদ্ধি ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মত অতি সূক্ষ্ম তর্কের বাহাদুরীতে ছোটে ভাল, কিন্তু কর্ম্মের পথে গাড়ি লইয়া চলে না। বিদ্যাসাগর যদি-চ ব্রাহ্মণ, এবং ন্যায়শাস্ত্রও যথোচিত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তথাপি যাহাকে বলে কাণ্ডজ্ঞান, সেটা তাঁহার যথেষ্ট ছিল। এই কাণ্ডজ্ঞানটি যদি না থাকিত, তবে যিনি একসময় ছোলা ও বাতাসা জলপান করিয়া পাঠ-শিক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি অকুতোভয়ে চাক্‌রী ছাড়িয়া দিয়া স্বাধীন-জীবিকা অবলম্বন করিয়া জীবনের মধ্যপথে সচ্ছলস্বচ্ছন্দাবস্থায় উত্তীর্ণ হইতে পারিতেন না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, দয়ার অনুরোধে

যিনি ভূরিভূরি স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন, যিনি স্বার্থের অনুরোধে আপন মহোচ্চ আত্মসম্মানকে মুহূর্ত্তের জন্য তিলমাত্র অবনত হইতে দেন নাই, যিনি আপনার ন্যায়সঙ্কল্পের ঋজুরেখা হইতে কোনো মন্ত্রণায়, কোনো প্রলোভনে দক্ষিণে-বামে কেশাগ্রপরিমাণ হেলিতে চাহেন নাই, তিনি কিরূপ প্রশস্তবুদ্ধি এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞার বলে সঙ্গতিসম্পন্ন হইয়া সহস্রের আশ্রয়দাতা হইয়াছিলেন। গিরিশৃঙ্গের দেবদারুদ্রুম যেমন শুষ্ক শিলাস্তরের মধ্যে অঙ্কুরিত হইয়া, প্রাণঘাতক হিমানীবৃষ্টি শিরোধার্য্য করিয়া, নিজের আভ্যন্তরীণ কঠিনশক্তির দ্বারা আপনাকে প্রচুরসরসশাখাপল্লবসম্পন্ন সরলমহিমায় অভ্রভেদী করিয়া তুলে—তেম্‌নি এই ব্রাহ্মণতনয় জন্ম-দারিদ্র্য এবং সর্ব্বপ্রকার প্রতিকূলতার মধ্যেও কেবল নিজের মজ্জাগত অপর্য্যাপ্ত বলবুদ্ধির দ্বারা নিজেকে যেন অনায়াসেই এমন সরল, এমন প্রবল, এমন সমুন্নত, এমন সর্ব্বসম্পৎশালী করিয়া তুলিয়াছিলেন।

মেট্রপলিটান্-বিদ্যালয়কে তিনি যে একাকী সর্ব্বপ্রকার বিঘ্নবিপত্তি হইতে রক্ষা করিয়া তাহাকে সগৌরবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিলেন—ইহাতে বিদ্যাসাগরের কেবল লোকহিতৈষা ও অধ্যবসায় নহে, তাঁহার সজাগ ও সহজ কর্ম্মবুদ্ধি প্রকাশ পায়। এই বুদ্ধিই যথার্থ পুরুষের বুদ্ধি,—এই বুদ্ধি সুদূরসম্ভবপর কাল্পনিক বাধাবিঘ্ন ও ফলাফলের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারজালের দ্বারা আপনাকে নিরুপায় অকর্ম্মণ্যতার মধ্যে জড়ীভূত করিয়া বসে না; এই বুদ্ধি, কেবল সূক্ষ্মভাবে নহে, প্রত্যুত প্রশস্তভাবে, সমগ্রভাবে কর্ম্ম ও কর্ম্মক্ষেত্রের আদ্যোপান্ত দেখিয়া লইয়া, দ্বিধা বিসর্জ্জন দিয়া, মুহূর্ত্তের মধ্যে উপস্থিত বাধার মর্ম্মস্থল আক্রমণ করিয়া, বীরের মত কাজ করিয়া যায়। এই সবল কর্ম্মবুদ্ধি বাঙালীর মধ্যে বিরল।

যেমন কর্ম্মবুদ্ধি, তেম্‌নি ধর্ম্মবুদ্ধির মধ্যেও একটা সবল কাণ্ডজ্ঞান থাকিলে, তাহার দ্বারা যথার্থ কাজ পাওয়া যায়। কবি বলিয়াছেন—

"ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ"। ধর্ম্মের গতি সূক্ষ্ম হইতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মের নীতি সরল ও প্রশস্ত। কারণ, তাহা বিশ্বসাধারণের এবং নিত্যকালের। তাহা পণ্ডিতের এবং তার্কিকের নহে। কিন্তু মনুষ্যের দুর্ভাগ্যক্রমে মানুষ আপন সংস্রবের সকল জিনিষকেই অলক্ষিতভাবে কৃত্রিম ও জটিল করিয়া তুলে। যাহা সরল, যাহা স্বাভাবিক, যাহা উন্মুক্ত-উদার, যাহা মূল্য দিয়া কিনিতে হয় না, বিধাতা যাহা আলোক ও বায়ুর ন্যায় মনুষ্য-সাধারণকে অযাচিত দান করিয়াছেন, মানুষ আপনি তাহাকে দুর্ম্মূল্য-দুর্গম করিয়া দেয়। সেইজন্য সহজ কথা ও সরল ভাব প্রচারের জন্য লোকোত্তর মহত্ত্বের অপেক্ষা করিতে হয়।

বিদ্যাসাগর বালবিধবাবিবাহের ঔচিত্যসম্বন্ধে যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাও অত্যন্ত সহজ; তাহার মধ্যে কোনো নূতনত্বের অসামান্য নৈপুণ্য নাই। তিনি প্রত্যক্ষব্যাপারকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া এক অমূলক কল্পনা-লোক সৃজন করিতে আপন শক্তির অপব্যয় করেন নাই। তিনি তাঁহার বিধবাবিবাহগ্রন্থে আমাদিগকে সম্বোধন করিয়া যে আক্ষেপোক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিলেই আমার কথাটি পরিষ্কার হইবে।

"হা ভারতবর্ষীয় মানবগণ!......অভ্যাসদোষে তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তিসকল এরূপ কলুষিত হইয়া গিয়াছে ও অভিভূত হইয়া রহিয়াছে যে, হতভাগা বিধবাদিগের দুরবস্থাদর্শনে, তোমাদের চিরশুষ্ক হৃদয়ে কারুণ্যরসের সঞ্চার হওয়া কঠিন, এবং ব্যভিচারদোষের ও ভ্রূণহত্যাপাপের প্রবল স্রোতে দেশ উচ্ছলিত হইতে দেখিয়াও, মনে ঘৃণার উদয় হওয়া অসম্ভাবিত। তোমরা প্রাণতুল্য কন্যা প্রভৃতিকে অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণানলে দগ্ধ করিতে সম্মত আছ; তাহারা দুর্নিবার-রিপু-বশীভূত হইয়া, ব্যভিচারদোষে দূষিত হইলে, তাহার পোষকতা করিতে সম্মত আছ; ধর্ম্মলোপভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া, কেবল লোকলজ্জাভয়ে, তাহা-দের ভ্রূণহত্যার সহায়তা করিয়া স্বয়ং সপরিবারে পাপপঙ্কে কলঙ্কিত

হইতে সম্মত আছ; কিন্তু, কি আশ্চর্য্য! শাস্ত্রের বিধি অবলম্বনপূর্ব্বক, পুনরায় বিবাহ দিয়া, তাহাদিগকে দুঃসহ বৈধব্যযন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ করিতে, এবং আপনাদিগকেও সকল বিপদ্ হইতে মুক্ত করিতে, সম্মত নহ। তোমরা মনে কর, পতিবিয়োগ হইলেই স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায়; দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না; যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয় না; দুর্জ্জয় রিপুবর্গ এককালে নির্ম্মূল হইয়া যায়। কিন্তু, তোমাদের এই সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, পদে পদে তাহার উদাহরণ প্রাপ্ত হইতেছ। ভাবিয়া দেখ, এই অনবধানদোষে, সংসারতরুর কি বিষময় ফলভোগ করিতেছ!”

রমণীর দেবীত্ব ও বালিকার ব্রহ্মচর্য্যমাহাত্ম্যের সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর আকাশগামী ভাবুকতার ভূরিপরিমাণ সজল বাষ্প সৃষ্টি করিতে বসেন নাই; তিনি তাঁহার পরিষ্কার সবল বুদ্ধি ও সরল সহৃদয়তা লইয়া সমাজের যথার্থ অবস্থা ও প্রকৃত বেদনায় সকরুণ হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। কেবলমাত্র মধুর বাক্যরসে চিঁড়াকে সরস করিতে সে-ই চায়, যাহার দধি নাই। কিন্তু বিদ্যাসাগরের দধির অভাব না থাকাতে বাক্‌পটুতার প্রয়োজন হয় নাই। দয়া আপনি দুঃখের স্থানে গিয়া আকৃষ্ট হয়। বিদ্যাসাগর স্পষ্ট দেখিতেছেন যে, প্রকৃত সংসারে বিধবা হইবামাত্র বালিকা হঠাৎ দেবী হইয়া উঠে না, এবং আমরাও তাহার চতুর্দ্দিকে নিষ্কলঙ্ক দেবলোক সৃষ্টি করিয়া বসিয়া নাই; এমন অবস্থায় সে-ও দুঃখ পায়, সমাজেরও রাশিরাশি অমঙ্গল ঘটে, ইহা প্রতিদিনের প্রত্যক্ষ সত্য। সেই দুঃখ, সেই অকল্যাণ নিবারণের উপযুক্ত উপায় অবলম্বন না করিয়া বিদ্যাসাগর থাকিতে পারেন না; আমরা সেস্থলে সুনিপুণ কাব্যকলা প্রয়োগপূর্ব্বক একটা স্বকপোলকল্পিত জগতের আদর্শ-বৈধব্য কল্পনা করিয়া তৃপ্তিলাভ করি। কারণ, তাঁহার সরল ধর্ম্মবুদ্ধিতে তিনি সহজেই যে বেদনা বোধ করিয়াছেন, আমরা সেই বেদনা যথার্থরূপে হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করি

না। সেইজন্ম এসম্বন্ধে আমাদের রচনায় নৈপুণ্য প্রকাশ পায়, সরলতা প্রকাশ পায় না। যথার্থ সবলতার সঙ্গে সঙ্গেই একটা সুবৃহৎ সরলতা থাকে।

এই সরলতা, কেবল মতামতে নহে, লোকব্যবহারেও প্রকাশ পায়। বিদ্যাসাগর পিতৃদর্শনে কাশীতে গমন করিলে সেখানকার অর্থলোলুপ কতকগুলি ব্রাহ্মণ তাঁহাকে টাকার জন্য ধরিয়া-পড়িয়া ছিল। বিদ্যা-সাগর তাহাদের অবস্থা ও স্বভাব দৃষ্টে তাহাদিগকে দয়া অথবা ভক্তির পাত্র বলিয়া জ্ঞান করেন নাই, সেইজন্য তৎক্ষণাৎ অকপটচিত্তে উত্তর দিলেন— "এখানে আছেন বলিয়া আপনাদিগকে যদি আমি ভক্তি বা শ্রদ্ধা করিয়া বিশ্বেশ্বর বলিয়া মান্য করি, তাহা হইলে আমার মত নরাধম আর নাই।" ... ... ইহা শুনিয়া কাশীর ব্রাহ্মণেরা ক্রোধান্ধ হইয়া বলেন, "তবে আপনি কি মানেন?" বিদ্যাসাগর উত্তর করিলেন—"আমার বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা উপস্থিত এই পিতৃদেব ও জননীদেবী বিরাজমান।" *

যে বিদ্যাসাগর হীনতমশ্রেণীর লোকেরও দুঃখমোচনে অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, তিনি কৃত্রিম কপটভক্তি দেখাইয়া কাশীর ব্রাহ্মণের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারিলেন না। ইহাই বলিষ্ঠ সরলতা, ইহাই যথার্থ পৌরুষ।

নিজের অশনবসনেও বিদ্যাসাগরের একটি অটল সরলতা ছিল। এবং সেই সরলতার মধ্যেও দৃঢ় বলের পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্ব্বেই দৃষ্টান্ত দেখান গিয়াছে, নিজের তিলমাত্র সম্মানরক্ষার প্রতিও তাঁহার লেশমাত্র শৈথিল্য ছিল না। আমরা সাধারণত প্রবল সাহেবী অথবা প্রচুর নবাবী দেখাইয়া সম্মানলাভের চেষ্টা করিয়া থাকি। কিন্তু আড়-ম্বরের চাপল্য বিদ্যাসাগরের উন্নত-কঠোর আত্মসম্মানকে কখনো স্পর্শ করিতে পারিত না। ভূষণহীন সারল্যই তাঁহার রাজভূষণ ছিল। ঈশ্বর-

* সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত বিদ্যাসাগরজীবনচরিত।

চন্দ্র যখন কলিকাতায় অধ্যয়ন করিতেন, তখন তাঁহার দরিদ্রা "জননী-দেবী চরকাসূতা কাটিয়া পুত্রদ্বয়ের বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া কলিকাতায় পাঠাই-তেন।" * সেই মোটাকাপড়, সেই মাতৃস্নেহমণ্ডিত দারিদ্র্য তিনি চিরকাল সগৌরবে সর্ব্বাঙ্গে ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বন্ধু তদানীন্তন লেফ্‌টেনেণ্ট্ গবর্ণর হ্যালিডেসাহেব তাঁহাকে রাজসাক্ষাতের উপযুক্ত সাজ করিয়া আসিতে অনুরোধ করেন। বন্ধুর অনুরোধে বিদ্যা-সাগর কেবল দুই একদিন চাগা-চাপকান পরিয়া সাহেবের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু সে লজ্জা আর সহ্য করিতে পারিলেন না। বলি-লেন, "আমাকে যদি এই বেশে আসিতে হয়, তবে এখানে আর আমি আসিতে পারিব না।" হ্যালিডে তাঁহাকে তাঁহার অভ্যস্তবেশে আসিতে অনু-মতি দিলেন। ব্রাহ্মণপণ্ডিত যে চটিজুতা ও মোটা ধুতিচাদর পরিয়া সর্ব্বত্র সম্মানলাভ করেন, বিদ্যাসাগর রাজদ্বারেও তাহা ত্যাগ করিবার আবশ্যকতা বোধ করেন নাই। তাঁহার নিজের সমাজে যখন ইহাই ভদ্রবেশ, তখন তিনি অন্য সমাজে অন্য বেশ পরিয়া আপন সমাজের ও সেই সঙ্গে আপনার অবমাননা করিতে চাহেন নাই। শাদা ধুতি ও শাদা চাদরকে ঈশ্বরচন্দ্র যে গৌরব অর্পণ করিয়াছিলেন, আমাদের বর্ত্তমান রাজাদের ছদ্মবেশ পরিয়া আমরা আপনাদিগকে সে গৌরব দিতে পারি না; বরঞ্চ এই কৃষ্ণচর্ম্মের উপর দ্বিগুণতর কৃষ্ণকলঙ্ক লেপন করি। আমাদের এই অবমানিত দেশে ঈশ্বরচন্দ্রের মত এমন অখণ্ড পৌরুষের আদর্শ কেমন করিয়া জন্মগ্রহণ করিল, আমরা বলিতে পারি না। কাকের বাসায় কোকিলে ডিম পাড়িয়া যায়,—মানব-ইতিহাসের বিধাতা সেইরূপ গোপনে কৌশলে বঙ্গভূমির প্রতি বিদ্যাসাগরকে মানুষ করিবার ভার দিয়াছিলেন।

সেইজন্য বিদ্যাসাগর এই বঙ্গদেশে একক ছিলেন। এখানে যেন

* সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত বিদ্যাসাগরজীবনচরিত।

তাঁহার স্বজাতি-সোদর কেহ ছিল না। এদেশে তিনি তাঁহার সমযোগ্য সহযোগীর অভাবে আমৃত্যুকাল নির্ব্বাসন ভোগ করিয়া গিয়াছেন। তিনি সুখী ছিলেন না। তিনি নিজের মধ্যে যে এক অকৃত্রিম মনুষ্যত্ব সর্ব্বদাই অনুভব করিতেন, চারিদিকের জনমণ্ডলীর মধ্যে তাহার আভাস দেখিতে পান নাই। তিনি উপকার করিয়া কৃতঘ্নতা পাইয়াছেন, কার্য্যকালে সহায়তা প্রাপ্ত হন নাই;—তিনি প্রতিদিন দেখিয়াছেন, আমরা আরম্ভ করি, শেষ করি না; আড়ম্বর করি, কাজ করি না; যাহা অনুষ্ঠান করি, তাহা বিশ্বাস করি না; যাহা বিশ্বাস করি, তাহা পালন করি না; ভূরিপরিমাণ বাক্যরচনা করিতে পারি, তিলপরিমাণ আত্মত্যাগ করিতে পারি না; আমরা অহঙ্কার দেখাইয়া পরিতৃপ্ত থাকি, যোগ্যতালাভের চেষ্টা করি না; আমরা সকল কাজেই পরের প্রত্যাশা করি, অথচ পরের ত্রুটি লইয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতে থাকি;—পরের অনুকরণে আমাদের গর্ব্ব, পরের অনুগ্রহে আমাদের সম্মান, পরের চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ করিয়া আমাদের পলিটিক্স্, এবং নিজের বাক্‌চাতুর্য্যে নিজের প্রতি ভক্তি-বিহ্বল হইয়া উঠাই আমাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। এই দুর্ব্বল, ক্ষুদ্র, হৃদয়হীন, কর্ম্মহীন, দাম্ভিক, তার্কিকজাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের এক সুগভীর ধিক্কার ছিল। কারণ, তিনি সর্ব্ববিষয়েই ইহাদের বিপরীত ছিলেন। বৃহৎ বনস্পতি যেমন ক্ষুদ্র বনজঙ্গলের পরিবেষ্টন হইতে ক্রমেই শূন্য আকাশে মস্তক তুলিয়া উঠে—বিদ্যাসাগর সেইরূপ বয়োবৃদ্ধিসহকারে বঙ্গসমাজের সমস্ত অস্বাস্থ্যকর ক্ষুদ্রতাজাল হইতে ক্রমশই শব্দহীন সুদূর নির্জ্জনে উত্থান করিয়াছিলেন; সেখান হইতে তিনি তাপিতকে ছায়া এবং ক্ষুধিতকে ফলদান করিতেন; কিন্তু আমাদের শতসহস্র ক্ষণজীবী সভাসমিতির ঝিল্লীঝঙ্কার হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিলেন। ক্ষুধিত-পীড়িত অনাথ-অসহায়দের জন্য আজ তিনি বর্ত্তমান নাই,—কিন্তু তাঁহার মহৎ চরিত্রের যে অক্ষয়বট তিনি বঙ্গভূমিতে রোপণ করিয়া গিয়া-

ছেন, তাহার তলদেশ সমস্ত বাঙালীজাতির তীর্থস্থান হইয়াছে। আমরা সেই-খানে আসিয়া আমাদের তুচ্ছতা, ক্ষুদ্রতা, নিষ্ফল আড়ম্বর ভুলিয়া, সূক্ষ্মতম তর্কজাল এবং স্থূলতম জড়ত্ব বিচ্ছিন্ন করিয়া, সরল, সবল, অটল মাহাত্ম্যের শিক্ষা লাভ করিয়া যাইব। আজ আমরা বিদ্যাসাগরকে কেবল বিদ্যা ও দয়ার আধার বলিয়া জানি, এই বৃহৎ পৃথিবীর সংস্রবে আসিয়া যতই আমরা মানুষ হইয়া উঠিব, যতই আমরা পুরুষের মত দুর্গম-বিস্তীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে থাকিব, বিচিত্র শৌর্য্য-বীর্য্য-মহত্বের সহিত যতই আমাদের প্রত্যক্ষ সন্নিহিতভাবে পরিচয় হইবে, ততই আমরা নিজের অন্তরের মধ্যে অনুভব করিতে থাকিব যে, দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রে প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব এবং যতই তাহা অনুভব করিব, ততই আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ ও বিধাতার উদ্দেশ্য সফল হইবে, এবং বিদ্যাসাগরের চরিত্র বাঙালীর জাতীয়জীবনে চিরদিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে।

১৩০২।

২

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বিদ্যাসাগরের জীবনীসম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার আরম্ভে যোগবাশিষ্ঠ হইতে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন—

"তরবোঽপি হি জীবন্তি জীবন্তি মৃগপক্ষিণঃ।
স জীবতি মনো যস্য মননেন হি জীবতি॥"

'তরুলতাও জীবনধারণ করে, পশুপক্ষীও জীবনধারণ করে; কিন্তু সে-ই প্রকৃতরূপে জীবিত, যে মননের দ্বারা জীবিত থাকে।'

মনের জীবন মননক্রিয়া এবং সেই জীবনেই মনুষ্যত্ব।

প্রাণ সমস্ত দেহকে ঐক্যদান করিয়া তাহার বিচিত্র কার্য্যসকলকে একতন্ত্রে নিয়মিত করে। প্রাণ চলিয়া গেলে দেহ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়, তাহার ঐক্য ছিন্ন হইয়া মাটির অংশ মাটিতে, জলের অংশ জলে মিশিয়া যায়। নিয়তক্রিয়াশীল নিরলস প্রাণই এই শরীরটাকে মাটি হইতে, জল হইতে উচ্চ করিয়া, স্বতন্ত্র করিয়া, এক করিয়া, স্বতশ্চালিত এক অপূর্ব্ব ইন্দ্রজাল রচনা করে।

মনের যে জীবন, শাস্ত্রে যাহাকে মনন বলিতেছে, তাহাও সেইরূপ মনকে এক করিয়া তাহাকে তাহার সমস্ত তুচ্ছতা, সমস্ত অসম্বদ্ধতা হইতে উদ্ধার করিয়া খাড়া করিয়া গড়িয়া তোলে, সেই মননদ্বারা ঐক্যপ্রাপ্ত মন বিচ্ছিন্নভাবে বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে না, সে মন বাহ্যপ্রবাহের মুখে জড়পুঞ্জের মত ভাসিয়া যায় না।

কোন মনস্বী ইংরাজলেখক বলিয়াছেন—এমন লোকটি পাওয়া দুর্লভ, যিনি নিজের পায়ের উপর খাড়া হইয়া দাঁড়াইতে পারেন, যিনি নিজের চিত্তবৃত্তিসম্বন্ধে সচেতন, কর্ম্মস্রোতকে প্রবাহিত এবং প্রতিহত করিবার মত বল যাঁহার আছে, যিনি ধাবমান জনতা হইতে আপনাকে উৰ্দ্ধে রাখিতে পারেন এবং সেই জনতাপ্রবাহ কোথা হইতে আসিতেছে ও কোথায় তাহার গতি তৎসম্বন্ধে যাঁহার একটি পরিস্কৃত সংস্কার আছে।

উক্ত লেখক যাহা বলিয়াছেন, তাহাকে সংক্ষেপে বলিতে হইলে বলা যায় যে, এমন লোক দুর্লভ,—"মনো যস্য মননেন হি জীবতি"

সাধারণ লোকের মধ্যে মন-নামক যে একটা ব্যাপার আছে বলিয়া ভ্রম হয়, তাহাকে খাড়া রাখিয়াছে কিসে? কেবল প্রথা এবং অভ্যাসে। তাহার জড় অঙ্গগুলি অভ্যাসের আটা দিয়া জোড়া—তাহা প্রাণের বন্ধনে এক হইয়া নাই। তাহার গতি চিরকালপ্রবাহিত দশজনের গতি, তাহার অদ্যতন দিন কল্যতন দিনের অভ্যস্ত অন্ধ পুনরাবৃত্তিমাত্র।

জলের মধ্যে তৃণ যেমন করিয়া ভাসিয়া যায়, মাছ তেমন করিয়া

ভাসে না। জলের পথ এবং মাছের পথ সর্ব্বদাই এক নহে। মাছকে খাদ্যের অনুসরণে, আত্মরক্ষার উত্তেজনায় নিয়ত আপনার পথ আপনি খুঁজিয়া লইতে হয়, তৃণ সে প্রয়োজন অনুভবই করে না।

মননক্রিয়াদ্বারা যে মন জীবিত, তাহাকেও আত্মরক্ষার জন্যই নিজের পথ নিজে খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। দশজনের মধ্যে ভাসিয়া চলা তাহার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।

সাধারণ বাঙালীর সহিত বিদ্যাসাগরের যে একটি জাতিগত সুমহান্ প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, সে প্রভেদ শাস্ত্রিমহাশয় যোগবাশিষ্ঠের একটিমাত্র শ্লোকের দ্বারা পরিস্ফুট করিয়াছেন। আমাদের অপেক্ষা বিদ্যাসাগরের একটা জীবন অধিক ছিল। তিনি কেবল দ্বিজ ছিলেন না, তিনি দ্বিগুণ-জীবিত ছিলেন।

সেইজন্য তাঁহার লক্ষ্য, তাঁহার আচরণ, তাঁহার কার্য্যপ্রণালী আমাদের মত ছিল না। আমাদের সম্মুখে আছে আমাদের ব্যক্তিগত সুখদুঃখ, ব্যক্তিগত লাভক্ষতি; তাঁহার সম্মুখেও অবশ্য সেগুলা ছিল, কিন্তু তাহার উপরও ছিল তাঁহার অন্তর্জীবনের সুখদুঃখ, মনোজীবনের লাভক্ষতি। সেই সুখদুঃখ-লাভক্ষতির নিকট বাহ্য সুখদুঃখ-লাভক্ষতি কিছুই নহে।

আমাদের বহির্জীবনেরও একটা লক্ষ্য আছে, তাহাকে সমস্ত জড়াইয়া এক কথায় স্বার্থ বলা যায়। আমাদের খাওয়া-পরা-শোওয়া, কাজকর্ম্ম করা, সমস্ত স্বার্থের অঙ্গ। ইহাই আমাদের বহির্জীবনের মূল-গ্রন্থি।

মননের দ্বারা আমরা যে অন্তর্জীবন লাভ করি, তাহার মূললক্ষ্য পরমার্থ। এই আমমহল ও খাসমহলের দুই কর্ত্তা—স্বার্থ ও পরমার্থ। ইহাদের সামঞ্জস্যসাধন করিয়া চলাই মানবজীবনের আদর্শ। কিন্তু মধ্যে মধ্যে সংসারের বিপাকে পড়িয়া যে অবস্থায় 'অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ', তখন

পরমার্থকে রাখিয়া স্বার্থই পরিত্যাজ্য, এবং যাঁহার মনোজীবন প্রবল, তিনি অবলীলাক্রমে সেই কাজ করিয়া থাকেন।

অধিকাংশের মন সজীব নয় বলিয়া শাস্ত্রে এবং লোকাচারে আমাদের মনঃপুত্তলীযন্ত্রে দম দিয়া তাহাকে একপ্রকার কৃত্রিম গতি দান করে। কেবল সেই জোরে আমরা বহুকাল ধরিয়া দয়া করি না, দান করি; ভক্তি করি না, পূজা করি; চিন্তা করি না, কর্ম্ম করি; বোধ করি না, অথচ সেইজন্যই কোন্‌টা ভাল ও কোন্‌টা মন্দ তাহা অত্যন্ত জোরের সহিত অতিশয় সংক্ষেপে চোখ বুজিয়া ঘোষণা করি। ইহাতে সজীব-দেবতা-স্বরূপ পরমার্থ আমাদের মনে জাগ্রত না থাকিলেও তাহার জড়প্রতিমা কোনোমতে আপনার ঠাট বজায় রাখে।

এই নির্জ্জীবতা ধরা পড়ে বাঁধা-নিয়মের নিশ্চেষ্ট অনুসরণ দ্বারা। যে সমাজে একজন অবিকল আর একজনের মত এবং এক কালের সহিত অন্য কালের বিশেষ প্রভেদ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, সে সমাজে পরমার্থ সজীব নাই এবং মননক্রিয়া একেবারে বন্ধ হইয়া গেছে, এ কথা নিশ্চয় বলা যাইতে পারে।

আমাদের দেশের কবি তাই বলিয়াছেন—"গতানুগতিকো লোকো ন লোকঃ পারমার্থিকঃ।" অর্থাৎ লোকে গতানুগতিক। লোক যে পারমার্থিক নহে এবং পারমার্থিক লোক গতানুগতিক হইয়া থাকিতে পারেন না, কবি এই নিগূঢ় কথাটি অনুভব করিয়াছেন।

বিদ্যাসাগর আর যাহাই হউন্, গতানুগতিক ছিলেন না। কেন ছিলেন না? তাহার প্রধান কারণ, মননজীবনই তাঁহার মুখ্যজীবন ছিল।

অবশ্য, সকল দেশেই গতানুগতিকের সংখ্যা বেশি। কিন্তু যে দেশে স্বাধীনতার স্ফূর্ত্তি ও বিচিত্র কর্ম্মের চাঞ্চল্য সর্ব্বদা বর্ত্তমান, সেখানে লোকসমাজমন্থনে সেই অমৃত উঠে,—যাহাতে মনকে জীবনদান করে, মননক্রিয়াকে সতেজ করিয়া তোলে।

তথাপি সকলেই জানেন, কার্লাইলের ন্যায় লেখক তাঁহাদের দেশের সাধারণ জনসমাজের অন্ধ মূঢ়তাকে কিরূপ সুতীব্র ভৎসনা করিয়াছেন।

কার্লাইল্‌ যাহাকে hero অর্থাৎ বীর বলেন, তিনি কে? The hero is he who lives in the inward sphere of things, in the True, Divine and Eternal, which exists always, unseen to most, under the Temporary, Trivial: his being is in that; he declares that abroad; by act or speech as it may be, in declaring himself abroad. অর্থাৎ তিনিই বীর, যিনি বিষয়পুঞ্জের অন্তরতর রাজ্যে সত্য, এবং দিব্য এবং অনন্তকে আশ্রয় করিয়া আছেন;—যে সত্য, দিব্য ও অনন্ত পদার্থ অধিকাংশের অগোচরে চারিদিকের তুচ্ছ এবং ক্ষণিক ব্যাপারের অভ্যন্তরে নিত্যকাল বিরাজ করিতেছেন; সেই অন্তররাজ্যেই তাঁহার অস্তিত্ব; কর্ম্মদ্বারা অথবা বাক্যদ্বারা নিজেকে বাহিরে প্রকাশ করিয়া তিনি সেই অন্তররাজ্যকেই বাহিরে বিস্তার করিতেছেন। কার্লাইলের মতে ইঁহারা কাপড় ঝুলাইবার আল্‌না বা হজম করিবার যন্ত্র নহেন, ইঁহারাই সজীব মনুষ্য, অর্থাৎ সেই একই কথা—স জীবতি মনো যস্য মননেন হি জীবতি। অথবা অন্য কবির ভাষায় ইঁহারা গতানুগতিকমাত্র নহেন, ইঁহারা পারমার্থিক।

আমরা স্বার্থকে যেমন সহজে এবং সুতীব্রভাবে অনুভব করি, মননজীবিগণ পরমার্থকে ঠিক তেম্‌নি সহজে অনুভব করেন এবং তাহার দ্বারা তেম্‌নি অনায়াসে চালিত হন। তাঁহাদের দ্বিতীয় জীবন, তাঁহাদের অন্তরতর প্রাণ যে খাদ্য চায়, যে বেদনা বোধ করে, যে আনন্দামৃতে সাংসারিক ক্ষতি এবং মৃত্যুর বিরুদ্ধেও অমর হইয়া উঠে, আমাদের নিকট তাহার অস্তিত্বই নাই।

পৃথিবীর এমন একদিন ছিল, যখন সে কেবল আপনার দ্রবীভূত

ধাতুপ্রস্তরময় ভূপিণ্ড লইয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিত। বহুযুগ পরে তাহার নিজের অভ্যন্তরে এক অপরূপ প্রাণশক্তির বিকাশে জীবনে এবং সৌন্দর্য্যে তাহার স্থলজল পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

মানবসমাজেও মননশক্তিদ্বারা মনঃসৃষ্টি বহুযুগের এক বিচিত্র-ব্যাপার। তাহার সৃষ্টিকার্য্য অনবরত চলিতেছে, কিন্তু এখনো সর্ব্বত্র যেন দানা বাঁধিয়া উঠে নাই। মাঝে মাঝে এক এক স্থানে যখন তাহা পরিস্ফুট হইয়া উঠে, তখন চারিদিকের সহিত তাহার পার্থক্য অত্যন্ত বেশি বোধ হয়।

বাংলাদেশে বিদ্যাসাগরকে সেইজন্য সাধারণ হইতে অত্যন্ত পৃথক্ দেখিতে হইয়াছে। সাধারণত আমরা যে পরমার্থের প্রভাব একেবারেই অনুভব করি না, তাহা নহে; মধ্যে মধ্যে বহুকাল গুমটের পর হঠাৎ একদিন ভিতর হইতে একটা আধ্যাত্মিক ঝড়ের বেগ আমাদিগকে স্বার্থ ও সুবিধা লঙ্ঘন করিয়া আরাম ও অভ্যাসের বাহিরে ক্ষণকালের জন্য আকর্ষণ করে, কিন্তু সে সকল দম্‌কা-হাওয়া চলিয়া গেলে সে কথা আর মনেও থাকে না; আবার সেই আহারবিহার-আমোদপ্রমোদের নিত্যচক্রের মধ্যে ঘুরিতে আরম্ভ করি।

ইহার কারণ, মনোজীবন আমাদের মধ্যে পরিণতিলাভ করে নাই,—আগাগোড়া বাঁধিয়া যায় নাই। চেতনা ও বেদনার আভাস সে অনুভব করে, কিন্তু তাহার স্থায়িত্ব নাই। অনুভূতি হইতে কার্য্যসম্পাদন পর্য্যন্ত অবিচ্ছেদ যোগ ও অনিবার্য্য বেগ থাকে না। কাজের সহিত ভাবের ও ভাবের সহিত মনের সচেতন নাড়ীজালের সজীববন্ধন স্থাপিত হয় নাই।

যাঁহাদের মধ্যে সেই বন্ধন স্থাপিত হইয়াছে, যাঁহারা সেই দ্বিতীয়-জীবন লাভ করিয়াছেন, পরমার্থদ্বারা শেষ পর্য্যন্ত চালিত না হইয়া তাঁহাদের থাকিবার জো নাই। তাঁহাদের একটা দ্বিতীয় চেতনা আছে—সে চেতনার সমস্ত বেদনা আমাদের অনুভবের অতীত।

বিদ্যাসাগর সেই দ্বিতীয় চেতনা লইয়া সংসারে জন্মগ্রহণ করাতে তাঁহার বেদনার অন্ত ছিল না। চারিদিকের অসাড়তার মধ্যে এই ব্যথিত বিশালহৃদয় কেবল নিঃসহায়ভাবে, কেবল আপনার প্রাণের জোরে, কেবল আপনার বেদনার উত্তাপে একাকী আপন কাজ করিয়াছেন।

সাধারণলোকের হিসাবে সে সমস্ত কাজের কোনো প্রয়োজন ছিল না। তিনি কেবলমাত্র পাণ্ডিত্যে এবং বিদ্যালয়পাঠ্য-গ্রন্থবিক্রয়দ্বারা ধনোপার্জ্জনে সংসারে যথেষ্ট সম্মানপ্রতিপত্তি লাভ করিয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার নিজের হিসাবে এ সমস্ত কাজের একান্ত প্রয়োজন ছিল;—নতুবা তিনি যে অধিক জীবন বহন করিতেন, সে জীবনের নিশ্বাসরোধ হইত;—তাঁহার ধনোপার্জ্জন ও সম্মানলাভে তাহাকে রক্ষা করিতে পারিত না।

বালবিধবার দুঃখে দুঃখবোধ আমাদের পক্ষে একটি ক্ষণিক ভাবোদ্রেক মাত্র। তাহাদের বেদনা আমাদের জীবনকে স্পর্শ করে না। কারণ, আমরা গতানুগতিক; যেখানে দশজনের বেদনাবোধ নাই, সেখানে আমরা অচেতন। আমরা প্রকৃতরূপে, প্রত্যক্ষরূপে, অব্যবহিত-রূপে, তাহাদের বঞ্চিত জীবনের সমস্ত দুঃখ ও অবমাননাকে আপনার দুঃখ ও অবমাননারূপে অনুভব করিতে পারি না। কিন্তু ঈশ্বর বিদ্যাসাগরকে আপন অতিচেতনার দণ্ডবহন করিতে হইয়াছিল। অভ্যাস, লোকাচার ও অসাড়তার পাষাণব্যবধান আশ্রয় করিয়া পরের দুঃখ হইতে তিনি আপনাকে রক্ষা করিতে পারেন নাই। এইজন্য আমরা যেমন ব্যাকুলভাবে আপনার দুঃখ-মোচন করিতে চেষ্টা করিয়া থাকি, তিনি যেন তাহা অপেক্ষা অধিক প্রাণপণে দ্বিগুণতর প্রতিজ্ঞাসহকারে বিধবাগণকে অচলস্পর্শ অচেতন নিষ্ঠুরতা হইতে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমাদের

পক্ষে স্বার্থ যেমন প্রবল, পরমার্থ তাঁহার পক্ষে ততোধিক প্রবল ছিল।

এমন একটি দৃষ্টান্ত দিলাম। কিন্তু তাঁহার জীবনের সকল কার্য্যেই দেখা গিয়াছে, তিনি যে চেতনারাজ্যে, যে মননলোকে বাস করিতেন, আমরা তাহা হইতে বহুদূরে অবস্থিত; তাঁহার চিন্তা ও চেষ্টা, বুদ্ধি ও বেদনা গতানুগতিকের মত ছিল না, তাহা পারমার্থিক ছিল।

তাঁহার মত লোক পারমার্থিকতাভ্রষ্ট বঙ্গদেশে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া, চতুর্দ্দিকের নিঃসাড়তার পাষাণখণ্ডে বারংবার আহত-প্রতিহত হইয়াছিলেন বলিয়া, বিদ্যাসাগর তাঁহার কর্ম্মসঙ্কুল জীবন যেন চিরদিন ব্যথিতক্ষুব্ধভাবে যাপন করিয়াছেন। তিনি যেন সৈন্যহীন বিদ্রোহীর মত তাঁহার চতুর্দ্দিক্‌কে অবজ্ঞা করিয়া জীবনরণরঙ্গভূমির প্রান্ত পর্য্যন্ত জয়ধ্বজা নিজের স্কন্ধে একাকী বহন করিয়া লইয়া গেছেন। তিনি কাহাকেও ডাকেন নাই, তিনি কাহারো সাড়াও পান নাই, অথচ বাধা ছিল পদে পদে। তাঁহার মননজীবী অন্তঃকরণ তাঁহাকে প্রবল আবেগে কাজ করাইয়াছিল, কিন্তু গতজীবন বহিঃসংসার তাঁহাকে আশ্বাস দেয় নাই। তিনি যে শব-সাধনায় প্রবৃত্ত ছিলেন, তাহার উত্তরদায়কও ছিলেন তিনি নিজে।

আধুনিক ইংলণ্ডে বিদ্যাসাগরের ঠিক উপমা পাওয়া যায় না। কেবল জন্‌সনের সহিত কতকগুলি বিষয়ে তাঁহার অত্যন্ত সাদৃশ্য দেখিতে পাই। সে সাদৃশ্য বাহিরের কাজে ততটা নয়—কারণ, কাজে বিদ্যাসাগর জন্‌সন্ অপেক্ষা অনেক বড় ছিলেন; কিন্তু এই সাদৃশ্য অন্তরের সরল, প্রবল এবং অকৃত্রিম মনুষ্যত্বে। জন্‌সন্‌ও বিদ্যাসাগরের ন্যায় বাহিরে রূঢ় ও অন্তরে সুকোমল ছিলেন; জন্‌সন্‌ও পাণ্ডিত্যে অসামান্য, বাক্যালাপে সুরসিক, ক্রোধে উদ্দীপ্ত, স্নেহরসে আর্দ্র, মতে নির্ভীক, হৃদয়ভাবে অকপট এবং পরহিতৈষায় আত্মবিস্মৃত ছিলেন। দুর্ব্বিষহ দারিদ্র্যও মুহূর্ত্ত-কালের জন্য তাঁহার আত্মসম্মান আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই। সুবিখ্যাত

ইংরাজিলেখক লেস্‌লি ষ্টীফ্‌ন্‌ জন্‌সন্‌সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া দিলাম।

‘মতের পরিবর্ত্তে কেবল কথামাত্রদ্বারা তাঁহাকে ভুলাইবার জো ছিল না, এবং তিনি এমন কোনো মতবাদও গ্রাহ্য করিতেন না,—যাহা অকৃত্রিম-আবেগ-উৎপাদনে অক্ষম। ইহা ব্যতীত তাঁহার হৃদয়বৃত্তিসকল যেমন অকৃত্রিম, তেম্‌নি গভীর এবং সুকোমল ছিল। তাঁহার বৃদ্ধা এবং কুশ্রী স্ত্রীর প্রতি তাঁহার প্রেম কি পবিত্র ছিল। যেখানে কিছুমাত্র উপকারে লাগিত, সেখানে তাঁহার করুণা কিরূপ সবেগে অগ্রসর হইত, “গ্রাব্‌ষ্ট্রীটে”র সর্ব্বপ্রকার প্রলোভন হইতে তিনি কিরূপ পুরুষোচিত আত্ম-সম্মানের সহিত আপন সম্ভ্রমরক্ষা করিয়াছিলেন, সে সব কথার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই। কিন্তু বোধ করি, এ সকল গুণের একান্ত দুর্লভতা-সম্বন্ধে মনোযোগ আকর্ষণ করা ভাল। বোধ হয় অনেকেই আপন পিতাকে ভালবাসে; সৌভাগ্যক্রমে তাহা সত্য; কিন্তু কটা লোক আছে, যাহার পিতৃভক্তি ক্ষ্যাপামি-অপবাদের আশঙ্কা অতিক্রম করিতে পারে? কয়জন আছেন, যাঁহারা বহুদিনগত এক অবাধ্যতা-অপরাধের প্রায়শ্চিত্তসাধনের জন্য য়ুটক্‌সিটারের হাটে পিতার মৃত্যুর বহুবৎসর পরেও যাত্রা করিতে পারেন? সমাজত্যক্তা রমণী পথপ্রান্তে নিরাশ্রয়ভাবে পড়িয়া আছে দেখিলে আমাদের অনেকেরই মনে ক্ষণিক দয়ার আবেশ হয়। আমরা হয় ত পুলিস্‌কে ডাকি, কিংবা ঠিকাগাড়িতে চড়াইয়া দিয়া তাহাকে সরকারী দরিদ্রাশ্রমে পাঠাই, অথবা বড় জোর সরকারী দরিদ্রপালনব্যবস্থার অসম্পূর্ণতার বিরুদ্ধে টাইমস্‌পত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাই। কিন্তু এ প্রশ্ন বোধ করি জিজ্ঞাসা না করাই ভাল যে, কয়জন সাধু আছেন, যাঁহারা তাহাকে কাঁধে করিয়া নিজের বাড়ীতে লইয়া যাইতে পারেন, এবং তাহার অভাবসকল মোচন করিয়া দিয়া তাহার জীবনযাত্রার সুব্যবস্থা করিয়া দেন। অনেক বড়লোকের জীবনে

আমরা সাধুভাব ও সদাচার দেখিতে পাই; কিন্তু ভাললোকের মধ্যেও এমন আদর্শ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না, যাঁহার জীবন প্রচলিত লোকাচারের দ্বারা গঠিত নহে, অথবা যাঁহার হৃদয়বৃত্তি চিরাভ্যস্ত শিষ্ট-প্রথার বাঁধা-খাল উদ্বেল করিয়া উঠিতে পারে। জন্‌সনের চরিত্রের প্রতি আমাদের যে প্রীতি জন্মে, তাহার প্রধান কারণ, তাঁহার জীবন যে নেমি আশ্রয় করিয়া আবর্ত্তিত হইত, তাহা মহত্ব, তাহা প্রথামাত্রের দাসত্ব নহে। * * * অ্যাডিসন্‌ দেখাইয়াছিলেন, খৃষ্টানের মরণ কিরূপ;—কিন্তু তাঁহার জীবন আরামের অবস্থা ও ষ্টেট্‌সেক্রেটারির পদ এবং কাউণ্টে-সের সহিত বিবাহের মধ্য দিয়া অতি অবাধে প্রবাহিত হইয়াছিল; মাঝে মাঝে পোর্ট্‌মদিরার অতিসেবন ছাড়া আর কিছুতেই তাঁহার নাড়ি ও তাঁহার মেজাজকে চঞ্চল করিতে পারে নাই। কিন্তু আর একজন কঠিন বৃদ্ধ তীর্থযাত্রী, যিনি অন্তর এবং বাহিরের দুঃখরাশিসত্ত্বেও যুদ্ধ করিয়া জীবনকে শান্তির পথে লইয়া গেছেন, যিনি এই সংসারের মায়ার হাটে উপহসিত হইয়া মৃত্যুচ্ছায়ার অন্ধগুহামধ্যে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এবং যিনি নৈরাশ্যদৈত্যের বন্ধন হইতে বহু চেষ্টায়, বহু কষ্টে উদ্ধার পাইয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুশয্যায় আমাদের মনে গভীরতর ভাবাবেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। যখন দেখিতে পাই, এই লোকের অন্তিমকালের হৃদয়-বৃত্তি কিরূপ কোমল, গম্ভীর এবং সরল, তখন আমরা স্বতই অনুভব করি যে, যে নিরীহ ভদ্রলোকটি পরম শিষ্টাচার রক্ষা করিয়া বাঁচিয়াছিলেন ও মরিয়াছিলেন, তাঁহার অপেক্ষা উন্নততর সত্তার সন্নিধানে বর্ত্তমান আছি।'

এই বর্ণনা পাঠ করিলে বিদ্যাসাগরের সহিত জন্‌সনের সাদৃশ্য সহজেই মনে পড়ে। বিদ্যাসাগরও কেবল ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ অভ্যস্ত ভব্যতার মধ্য দিয়া চলিতে পারেন নাই, তাঁহারও স্নেহভক্তিদয়া, তাঁহার বিপুল-বিস্তীর্ণ হৃদয় সমস্ত আদবকায়দাকে বিদীর্ণ করিয়া কেমন অসামান্য আকারে

ব্যক্ত হইত, তাহা তাঁহার জীবনচরিতে নানা ঘটনায় প্রকাশ পাইয়াছে।

এইখানে জন্‌সন্‌সম্বন্ধে কার্লাইল্‌ যাহা লিখিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ অনুবাদ করি।

'তিনি বলিষ্ঠচেতা এবং মহৎ-লোক ছিলেন। শেষ পর্য্যন্তই অনেক জিনিষ তাঁহার মধ্যে অপরিণত থাকিয়া গিয়াছিল; অনুকূল উপকরণের মধ্যে তিনি কি না হইতে পারিতেন—কবি, ঋষি, রাজাধিরাজ। কিন্তু মোটের উপরে, নিজের 'উপকরণ', নিজের 'কাল' এবং ঐগুলা লইয়া নালিস করিবার প্রয়োজন কোনো লোকেরই নাই; উহা একটা নিষ্ফল আক্ষেপমাত্র। তাঁহার কালটা খারাপ ছিল, ভালই, তিনি সেটাকে আরো ভাল করিবার জন্যই আসিয়াছেন! জন্‌সনের কৈশোরকাল ধনহীন, সঙ্গহীন, আশাহীন এবং দুর্ভাগ্যজালে বিজড়িত ছিল। তা থাক্‌, কিন্তু বাহ্য অবস্থা অনুকূলতম হইলেও জন্‌সনের জীবন দুঃখের জীবন হওয়া ছাড়া আর কিছু হওয়া সম্ভবপর হইত না। প্রকৃতি তাঁহার মহত্ত্বের প্রতিদানস্বরূপ তাঁহাকে বলিয়াছিল, রোগাতুর দুঃখরাশির মধ্যে বাস কর। না, বোধ করি, দুঃখ এবং মহত্ত্ব ঘনিষ্ঠভাবে, এমন কি, অচ্ছেদ্যভাবে পরস্পর জড়িত ছিল। যে কারণেই হোক্‌, অভাগা জন্‌সন্‌কে নিয়তই রোগাবিষ্টতা, শারীরিক ও আধ্যাত্মিক বেদনা কোমরে বাঁধিয়া ফিরিতে হইত। তাঁহাকে একবার কল্পনা করিয়া দেখ, তাঁহার সেই রুগ্‌ণশরীর, তাঁহার ক্ষুধিত প্রকাণ্ড হৃদয় এবং অনির্ব্বচনীয় উদ্বর্ত্তিত চিন্তাপুঞ্জ লইয়া পৃথিবীতে বিপদাকীর্ণ বিদেশীর মত ফিরিতেছেন, ব্যগ্রভাবে গ্রাস করিতেছেন যে-কোন পরমার্থিক পদার্থ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া পড়ে, আর যদি কিছুই না পান, তবে অন্তত বিদ্যালয়ের ভাষা এবং কেবলমাত্র ব্যাকরণের ব্যাপার! সমস্ত ইংলণ্ডের মধ্যে বিপুলতম অন্তঃকরণ যাহা ছিল, তাঁহারই ছিল, অথচ তাহার জন্য বরাদ্দ ছিল

সাড়ে চার-আনা করিয়া প্রতিদিন। তবু সে হৃদয় ছিল অপরাজিত মহাবলী, প্রকৃত মনুষ্যের হৃদয়! অক্সফোর্ডে তাঁহার সেই জুতাজোড়ার গল্পটা সর্ব্বদাই মনে পড়ে; মনে পড়ে, কেমন করিয়া সেই দাগকাটা মুখ, হাড়-বাহির-করা কলেজের দীনছাত্র শীতের সময় জীর্ণ জুতা লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; কেমন করিয়া এক কৃপালু সচ্ছল ছাত্র গোপনে একজোড়া জুতা তাঁহার দরজার কাছে রাখিয়া দিল, এবং সেই হাড়-বাহির-করা দরিদ্র ছাত্র সেটা তুলিল, কাছে আনিয়া তাহার বহুচিন্তাজালে অস্ফুট-দৃষ্টির নিকট ধরিল এবং তাহার পরে জানালার বাহিরে দূর করিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিল। ভিজা পা বল, পঙ্ক বল, বরফ বল, ক্ষুধা বল, সবই সহ্য হয়, কিন্তু ভিক্ষা নহে; আমরা ভিক্ষা সহ্য করিতে পারি না! এখানে কেবল রূঢ় সুদৃঢ় আত্মসহায়তা। দৈন্যমালিন্য, উদ্ভ্রান্ত বেদনা এবং অভাবের অন্ত নাই, তথাপি অন্তরের মহত্ত্ব এবং পৌরুষ! এই যে জুতা ছুঁড়িয়া ফেলা, ইহাই এ মানুষটির জীবনের ছাঁচ। একটি স্বকীয়তন্ত্র (original) মানুষ, এ তোমার গতানুগতিক, ঋণপ্রার্থী, ভিক্ষাজীবী লোক নহে। আর যাই হৌক্, আমরা আমাদের নিজের ভিত্তির উপরেই যেন স্থিতি করি,—সেই জুতা পায়ে দিয়াই দাঁড়ান যাক্ যাহা আমরা নিজে জোটাইতে পারি। যদি তেমনই ঘটে, তবে পাঁকের উপর চলিব, বরফের উপরেই চলিব, কিন্তু উন্নতভাবে চলিব; প্রকৃতি আমাদিগকে যে সত্য দিয়াছেন, তাহারই উপর চলিব; অপরকে যাহা দিয়াছেন, তাহারই নকলের উপর চলিব না।'

কার্লাইল্ যাহা লিখিয়াছেন, তাহার ঘটনাসম্বন্ধে না মিলুক্, তাহার মর্ম্মকথাটুকু বিদ্যাসাগরের অবিকল খাটে। তিনি গতানুগতিক ছিলেন না, তিনি স্বতন্ত্র, সচেতন, পারমার্থিক ছিলেন; শেষদিন পর্য্যন্ত তাঁহার জুতা তাঁহার নিজেরই চটিজুতা ছিল। আমাদের কেবল আক্ষেপ এই যে, বিদ্যাসাগরের বস্ওয়েল্ কেহ ছিল না, তাঁহার মনের তীক্ষ্ণতা, সবলতা,

গভীরতা ও সহৃদয়তা তাঁহার বাক্যালাপের মধ্যে প্রতিদিন প্রচুর বিকীর্ণ হইয়া গেছে, অদ্য সে আর উদ্ধার করিবার উপায় নাই। বস্‌ওয়েল্‌ না থাকিলে জন্‌সনের মনুষ্যত্ব লোকসমাজে স্থায়ী আদর্শ দান করিতে পারিত না। সৌভাগ্যক্রমে বিদ্যাসাগরের মনুষ্যত্ব তাঁহার কাজের মধ্যে আপনার ছাপ রাখিয়া যাইবে, কিন্তু তাঁহার অসামান্য মনস্বিতা, যাহা তিনি অধিকাংশসময়ে মুখের কথায় ছড়াইয়া দিয়াছেন, তাহা কেবল অপরিস্ফুট জনশ্রুতির মধ্যে অসম্পূর্ণ আকারে বিরাজ করিবে।

১৩০৫।

রামমোহন রায়।

মহাপুরুষেরা সমস্ত মানবজাতির গৌরবের ও আদর্শের স্থল বটেন, কিন্তু তাঁহারা জাতিবিশেষের বিশেষ গৌরবের স্থল, তাহার আর সন্দেহ নাই। গৌরবের স্থল বলিলে যে কেবলমাত্র সামান্য অহঙ্কারের স্থল বুঝায়, তাহা নহে, গৌরবের স্থল বলিলে শিক্ষার স্থল, বললাভের স্থল বুঝায়। মহাপুরুষদিগের মহৎকার্য্যসকল দেখিয়া কেবলমাত্র সম্ভ্রমমিশ্রিত বিস্ময়ের উদ্রেক হইলেই যথেষ্ট ফললাভ হয় না—তাঁহাদিগকে যতই 'আমার' মনে করিয়া তাঁহাদের প্রতি যতই প্রেমের উদ্রেক হয়, ততই তাঁহাদের কথা, তাঁহাদের কার্য্য, তাঁহাদের চরিত্র আমাদের নিকট জীবন্ত হইয়া উঠে। যাঁহাদিগকে লইয়া আমরা গৌরব করি, তাঁহাদিগকে শুদ্ধমাত্র যে আমরা ভক্তি করি, তাহা নহে, তাঁহাদিগকে 'আমার' বলিয়া মনে করি। এইজন্য তাঁহাদের মহত্ত্বের আলোক বিশেষরূপে আমাদেরই উপরে আসিয়া পড়ে, বিশেষরূপে আমাদেরই মুখ উজ্জ্বল করে। শিশু যেমন সহস্র বলবান্ ব্যক্তিকে ফেলিয়া বিপদের সময় পিতার কোলে

আশ্রয় লইতে যায়, তেমনি আমরা দেশের দুর্গতির দিনে আর সকলকে ফেলিয়া আমাদের স্বদেশীয় মহাপুরুষদিগের অটল আশ্রয় অবলম্বন করিবার জন্য ব্যাকুল হই। তখন আমাদের নিরাশহৃদয়ে তাঁহারা যেমন বলবিধান করিতে পারেন, এমন আর কেহই নহে। ইংলণ্ডের দুর্গতি কল্পনা করিয়া কবি ওয়ার্ড্‌স্বার্থ পৃথিবীর আর সমস্ত মহাপুরুষকে ফেলিয়া কাতরস্বরে মিল্টন্‌কেই ডাকিলেন, কহিলেন—"মিল্টন্, আহা, তুমি যদি আজ বাঁচিয়া থাকিতে! তোমাকে ইংলণ্ডের বড়ই আবশ্যক হইয়াছে।" যে জাতির মধ্যে স্বদেশীয় মহাপুরুষ জন্মান নাই, সে জাতি কাহার মুখ চাহিবে, তাহার কি দুর্দ্দশা! কিন্তু যে জাতির মধ্যে মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তথাপি যে জাতি কল্পনার জড়তা, হৃদয়ের পক্ষাঘাত বশত তাঁহার মহত্ত্ব কোনোমতে অনুভব করিতে পারে না, তাহার কি দুর্ভাগ্য!

আমাদের কি দুর্ভাগ্য! আমরা বঙ্গসমাজের বড় বড় যশোবুদ্বুদ-দিগকে বালুকার সিংহাসনের উপর বসাইয়া দুইদিনের মত পুষ্পচন্দন দিয়া মহত্ত্বপূজার স্পৃহা খেলাচ্ছলে চরিতার্থ করিতেছি, বিদেশীয়দের অনুকরণে কথায় কথায় সভা ডাকিয়া চাঁদা তুলিয়া মহত্ত্বপূজার একটা ভাণ ও আড়ম্বর করিতেছি!

রামমোহন রায়ের চরিত্র আলোচনা করিবার একটি গুরুতর আবশ্যকতা আছে। আমাদের এখনকার কালে তাঁহার মত আদর্শের নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। আমরা কাতরস্বরে তাঁহাকে বলিতে পারি —"রামমোহন রায়, আহা, তুমি যদি আজ বাঁচিয়া থাকিতে! তোমাকে বঙ্গদেশের বড়ই আবশ্যক হইয়াছে! আমরা বাক্‌পটু লোক—আমা-দিগকে তুমি কাজ করিতে শিখাও। আমরা আত্মম্ভরী—আমাদিগকে আত্মবিসর্জ্জন দিতে শিখাও। আমরা লঘুপ্রকৃতি—বিপ্লবের স্রোতে চরিত্রগৌরবের প্রভাবে আমাদিগকে অটল থাকিতে শিখাও। আমরা

বাহিরের প্রখর আলোকে অন্ধ, হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থ চিরোজ্জ্বল আলোকের সাহায্যে ভালমন্দ নির্ব্বাচন করিতে, ও স্বদেশের পক্ষে যাহা স্থায়ী ও যথার্থ মঙ্গল, তাহাই অবলম্বন করিতে শিক্ষা দাও!”

রামমোহন রায় যথার্থ কাজ করিয়াছেন। তাঁহার সময়ে প্রগল্‌ভা রসনার এত শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই, সুতরাং তাহার এত সমাদরও ছিল না। কিন্তু আর একটা কথা দেখিতে হইবে। একএকটা সময়ে কাজের ভিড় পড়িয়া যায়, কাজের হাট বসিয়া যায়, তখন কাজ করিতে অথবা কাজের ভাণ করিতে একটা আমোদ আছে। তখন সেই কার্য্যাড়ম্বর নাট্যরস জন্মাইয়া মানুষকে মত্ত করিয়া তুলে, বিশেষত একটা তুমুল কোলাহলে সকলে বাহ্যজ্ঞান বিস্মৃত হইয়া একপ্রকার বিহ্বল হইয়া পড়েন। কিন্তু রামমোহন রায়ের সময়ে বঙ্গসমাজের সে অবস্থা ছিল না। তখন কাজে মত্ততাসুখ ছিল না, একাকী ধীরভাবে সমস্ত কাজ করিতে হইত। সঙ্গিহীন সুগম্ভীর সমুদ্রের গর্ভে যেমন নীরবে অতি ধীরে ধীরে দ্বীপ নির্ম্মিত হইয়া উঠে, সঙ্কল্প তেম্নি অবিশ্রাম নীরবে গভীর হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া কার্য্য-আকারে পরিস্ফুট হইয়া উঠিত। মহত্বের প্রভাবে, হৃদয়ের অনুরাগের প্রভাবে কাজ না করিলে কাজ করিবার আর কোনো প্রবর্ত্তনাই তখন বর্ত্তমান ছিল না। অথচ কাজের ব্যাঘাত এখনকার চেয়ে ঢের বেশি ছিল। রামমোহন রায়ের যশের প্রলোভন কিছুমাত্র ছিল না। তিনি যতগুলি কাজ করিয়াছিলেন, কোনো কাজেই তাঁহার সমসাময়িক স্বদেশীয়দিগের নিকট হইতে যশের প্রত্যাশা করেন নাই। নিন্দাগ্লানি শ্রাবণের বারিধারার ন্যায় তাঁহার মাথার উপরে অবিশ্রাম বর্ষিত হইয়াছে—তবুও তাঁহাকে তাঁহার কার্য্য হইতে বিরত করিতে পারে নাই। নিজের মহত্বে তাঁহার কি অটল আশ্রয় ছিল, নিজের মহত্বের মধ্যেই তাঁহার হৃদয়ের কি সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি ছিল, স্বদেশের প্রতি তাঁহার কি স্বার্থশূন্য সুগভীর প্রেম ছিল। তাঁহার

স্বদেশীয় লোকেরা তাঁহার সহিত যোগ দেয় নাই,—তিনিও তাঁহার সময়ের স্বদেশীয় লোকদের হইতে বহুদূরে ছিলেন; তথাপি তাঁহার বিপুল হৃদয়ের প্রভাবে স্বদেশের যথার্থ মর্ম্মস্থলের সহিত আপনার সুদৃঢ় যোগরক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। বিদেশীয় শিক্ষায় সে বন্ধন ছিন্ন করিতে পারে নাই এবং তদপেক্ষা গুরুতর যে স্বদেশীয়ের উৎপীড়ন, তাহাতেও সে বন্ধন বিচ্ছিন্ন হয় নাই। এই অভিমানশূন্য বন্ধনের প্রভাবে তিনি স্বদেশের জন্য সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জ্জন করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি কি না করিয়াছিলেন? শিক্ষা বল, রাজনীতি বল, বঙ্গভাষা বল, বঙ্গসাহিত্য বল, সমাজ বল, ধর্ম্ম বল, বঙ্গসমাজের যে-কোন বিভাগে উত্তরোত্তর যতই উন্নতি হইতেছে, সে কেবল তাঁহারই হস্তাক্ষর কালের নূতন নূতন পৃষ্ঠায় উত্তরোত্তর পরিস্ফুট-তর হইয়া উঠিতেছে মাত্র। বঙ্গসমাজের সর্ব্বত্রই তাঁহার স্মরণস্তম্ভ মাথা তুলিয়া উঠিতেছে; তিনি এই মরুস্থলে যে সকল বীজ রোপণ করিয়া-ছিলেন, তাহারা বৃক্ষ হইয়া শাখাপ্রশাখায় প্রতিদিন বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। তাহারই বিপুল ছায়ায় বসিয়া আমরা কি তাঁহাকে স্মরণ করিব না?

তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মহত্ত্ব প্রকাশ পায়; আবার তিনি যাহা না করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মহত্ত্ব আরো প্রকাশ পায়। তিনি যে এত কাজ করিয়াছেন, কিছুরই মধ্যে তাঁহার আত্মপ্রতিষ্ঠা করেন নাই। তিনি যে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে নিজের অথবা আর কাহারো প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি গড়িয়া-পিটিয়া একটা নূতন ধর্ম্ম বানাইতে পারিতেন, তাহা না করিয়া পুরাতন ধর্ম্ম প্রচার করিলেন। তিনি নিজেকে গুরু বলিয়া চালাইতে পারিতেন, তাহা না করিয়া প্রাচীন ঋষিদিগকে গুরু বলিয়া মানিলেন। তিনি তাঁহার কাজ স্থায়ী করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার নাম স্থায়ী করিবার জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা করেন নাই, বরং তাহার

প্রতিকূলতা করিয়াছেন। এরূপ আত্মবিলোপ এখন ত দেখা যায় না। বড় বড় সংবাদপত্রপুট পরিপূর্ণ করিয়া অবিশ্রাম নিজের নামসুধাপানে একপ্রকার মত্ততা জন্মাইয়া আমাদের কাজের উৎসাহ জাগাইয়া রাখিতে হয়,—দেশের জন্য যে সামান্য কাজটুকু করি, তাহাও বিদেশী-আকারে সমাধা করি, চেষ্টা করি,—যাহাতে সে কাজটা বিদেশীয়দের নয়ন-আকর্ষণ পণ্যদ্রব্য হইয়া উঠে। স্তুতিকোলাহল ও দলস্থ লোকের অবিশ্রাম একমন্ত্রোচ্চারণশব্দে বিব্রত থাকিয়া স্থিরভাবে কোনো বিষয়ের যথার্থ ভালমন্দ বুঝিবার শক্তিও থাকে না, ততটা ইচ্ছাও থাকে না, একটা গোলযোগের আবর্ত্তের মধ্যে মহানন্দে ঘুরিতে থাকি ও মনে করিতে থাকি, বিদ্যুদ্‌বেগে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছি।

আমরা যে আত্মবিলোপ করিতে পারি না, তাহার কারণ, আমরা আপনাকে ধারণ করিতে পারি না। সামান্যমাত্র ভাবের প্রবাহ উপস্থিত হইলেই আমরাই সর্ব্বোপরি ভাসিয়া উঠি। আত্মগোপন করিতে পারি না বলিয়াই সর্ব্বদা ভাবিতে হয়, আমাকে কেমন দেখিতে হইতেছে। যাঁহারা মাঝারী-রকমের বড়লোক, তাঁহারা নিজের শুভসঙ্কল্প সিদ্ধ করিতে চান বটে, কিন্তু তৎসঙ্গে আপনাকেও প্রচলিত করিতে চান। এ বড় বিষম অবস্থা। আপনিই যখন আপনার সঙ্কল্পের প্রতিযোগী হইয়া উঠে, তখন সঙ্কল্পের অপেক্ষা আপনার প্রতি আদর স্বভাবতই কিঞ্চিৎ অধিক হইয়া পড়ে। তখন সঙ্কল্প অনেকসময়ে হীনবল, লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। কথায় কথায় তাহার পরিবর্ত্তন হয়। কিছু-কিছু ভাল কাজ সম্পন্ন হয়, কিন্তু সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কাজটি হইয়া উঠে না। যে আপনার পায়ে আপনি বাধাস্বরূপ বিরাজ করিতে থাকে, সংসারের সহস্র বাধা সে অতিক্রম করিবে কি করিয়া? যে ব্যক্তি আপনাকে ছাড়িয়া সংসারের মধ্যস্থলে নিজের শুভকার্য্য স্থাপন করে, সে স্থায়ী ভিত্তির উপরে নিজের মঙ্গলসঙ্কল্প প্রতিষ্ঠিত করে। আর যে নিজের উপরেই সমস্ত কার্য্যের প্রতিষ্ঠা করে,

সে যখন চলিয়া যায়, তাহার অসম্পূর্ণ কার্য্যও তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া যায়; যদি-বা বিশৃঙ্খল ভগ্নাবশেষ ধূলির উপরে পড়িয়া থাকে, তবে তাহার ভিত্তি কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। রামমোহন রায় আপনাকে ভুলিয়া নিজের মহতী ইচ্ছাকে বঙ্গসমাজের মধ্যে রোপণ করিয়াছিলেন, এইজন্য তিনি না থাকিলেও আজ তাঁহার সেই ইচ্ছা সজীবভাবে প্রতিদিন বঙ্গসমাজের চারিদিকে অবিশ্রাম কাজ করিতেছে। সমস্ত বঙ্গবাসী তাঁহার স্মৃতি হৃদয়পট হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারে, কিন্তু তাঁহার সেই অমর ইচ্ছার বংশ বঙ্গসমাজ হইতে বিলুপ্ত করিতে পারে না।

রামমোহন রায়ের আত্মধারণাশক্তি কিরূপ অসাধারণ ছিল, তাহা কল্পনা করিয়া দেখুন। অতি বাল্যকালে যখন তিনি হৃদয়ের পিপাসায় ভারতবর্ষের চতুর্দ্দিকে আকুল হইয়া ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার অন্তরে-বাহিরে কি সুগভীর অন্ধকার বিরাজ করিতেছিল! যখন এই মহানিশীথিনীকে মুহূর্ত্তে দগ্ধ করিয়া ফেলিয়া তাঁহার হৃদয়ে প্রখর আলোক দীপ্ত হইয়া উঠিল, তখন তাহাতে তাঁহাকে বিপর্য্যস্ত করিতে পারে নাই। সে তেজ, সে আলোক তিনি হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিলেন। যুগযুগান্তরের সঞ্চিত অন্ধকারময় অঙ্গারের খনিতে যদি বিদ্যুৎশিখা প্রবেশ করে, তবে সে কি কাণ্ডই উপস্থিত হয়, ভূগর্ভ শতধা বিদীর্ণ হইয়া যায়। তেম্‌নি সহসা জ্ঞানের নূতন উচ্ছ্বাস কয়জন সহজে ধারণ করিতে পারেন? কিন্তু রামমোহন রায় অত্যন্ত মহৎ ছিলেন, এইজন্য এই জ্ঞানের বন্যায় তাঁহার হৃদয় অটল ছিল; এই জ্ঞানের বিপ্লবের মধ্যে মাথা তুলিয়া, যাহা আমাদের দেশে ধ্রুব মঙ্গলের কারণ হইবে, তাহা নির্ব্বাচন করিতে পারিয়াছিলেন। এ সময়ে ধৈর্য্যরক্ষা করা যায় কি? আজিকার কালে আমরা ত ধৈর্য্য কাহাকে বলে, জানিই না। কিন্তু রামমোহন রায়ের কি অসামান্য ধৈর্য্যই ছিল। তিনি আর সমস্ত ফেলিয়া পর্ব্বতপ্রমাণ স্তূপাকার ভস্মের মধ্যে আচ্ছন্ন যে অগ্নি, ফুৎকার দিয়া তাহা-

কেই প্রজ্বলিত করিতে চাহিয়াছিলেন। তাড়াতাড়ি চমক লাগাইবার জন্য বিদেশী দেশালাই কাঠি জ্বালাইয়া যাদুগিরি করিতে চাহেন নাই। তিনি জানিতেন, ভস্মের মধ্যে যে অগ্নিকণিকা অবশিষ্ট আছে, তাহা ভারত-বাসীর হৃদয়ের গূঢ় অভ্যন্তরে নিহিত, সে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে আর নিভিবে না।

রামমোহন রায় যখন ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন, তখন এখানে চতুর্দ্দিকে কালরাত্রির অন্ধকার বিরাজ করিতেছিল। মিথ্যা ও মৃত্যুর বিরুদ্ধে তাঁহাকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। মিথ্যা ও মৃত্যু নামক মায়াবী রাজাদের প্রকৃত বল নাই, অমোঘ অস্ত্র নাই, কোথাও তাহাদের দাঁড়াইবার স্থল নাই, কেবল নিশীথের অন্ধকার ও একপ্রকার অনির্দ্দেশ্য বিভীষিকার উপরে তাহাদের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত। আমাদের অজ্ঞান, আমাদের হৃদয়ের দুর্ব্বলতাই তাহাদের বল। অতি-বড় ভীরুও প্রভাতের আলোকে প্রেতের নাম শুনিলে হাসিতে পারে, কিন্তু অন্ধকার নিশীথি-নীতে একটি শুষ্কপত্রের শব্দ, একটি তৃণের ছায়াও অবসর পাইয়া আমা-দের হৃদয়ে নিষ্ঠুর আধিপত্য করিতে থাকে। যথার্থ দস্যুভয় অপেক্ষা সেই মিথ্যা অনির্দ্দেশ্য ভয়ের শাসন প্রবলতর। অজ্ঞানের মধ্যে মানুষ যেমন নিরুপায়, যেমন অসহায়, এমন আর কোথায়! রামমোহন রায় যখন জাগ্রত হইয়া বঙ্গসমাজের চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, তখন বঙ্গসমাজ সেই প্রেতভূমি ছিল। তখন শ্মশানস্থলে প্রাচীনকালের হিন্দুধর্ম্মের প্রেতমাত্র রাজত্ব করিতেছিল। তাহার জীবন নাই, অস্তিত্ব নাই, কেবল অনুশাসন ও ভয় আছে মাত্র। সেই নিশীথে শ্মশানে সেই ভয়ের বিপক্ষে 'মা ভৈঃ' শব্দ উচ্চারণ করিয়া যিনি একাকী অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহার মাহাত্ম্য আমরা আজিকার এই দিনের আলোকে হয় ত ঠিক অনুভব করিতে পারিব না। যে ব্যক্তি সর্পবধ করিতে অগ্রসর হয়, তাহার কেবলমাত্র জীবনের আশঙ্কা থাকে, কিন্তু যে ব্যক্তি বাস্তুসর্প মারিতে যায়,

তাহার জীবনের আশঙ্কার অপেক্ষা অনির্দ্দেশ্য অমঙ্গলের আশঙ্কা বলবত্তর হইয়া উঠে। তেম্‌নি রামমোহন রায়ের সময়ে হিন্দুসমাজের ভগ্নভিত্তির সহস্র ছিদ্রে সহস্র বাস্তু-অমঙ্গল উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধমান বংশপরম্পরা লইয়া প্রাচীনতা ও জড়তার প্রভাবে অতিশয় স্থূলকায় হইয়া উঠিতেছিল। রামমোহন রায় সমাজকে এই সহস্র নাগপাশবন্ধন হইতে মুক্ত করিতে নির্ভয়ে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু এই নিদারুণ বন্ধন অনুরাগবন্ধনের ন্যায় সমাজকে জড়াইয়াছিল, এইজন্য সমস্ত বঙ্গসমাজ আর্ত্তনাদ করিয়া রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধে উত্থান করিল। আজি আমাদের বালকেরাও সেই সকল মৃতসর্পের উপরে হাস্যমুখে পদাঘাত করে, আমরা তাহাদিগকে নির্ব্বিষ ঢোঁড়াসাপ বলিয়া উপহাস করি—ইহাদের প্রবলপ্রতাপ, ইহাদের চক্ষের মোহ-আকর্ষণ, ইহাদের সুদীর্ঘ লাঙ্গুলের ভীষণ আলিঙ্গনের আশঙ্কা আমরা বিস্মৃত হইয়াছি।

একবার ভাঙ্‌চুর করিতে আরম্ভ করিলে একটা নেশা চড়িয়া যায়। সৃজনের যেমন আনন্দ আছে, প্রলয়ের তেম্‌নি একপ্রকার ভীষণ আনন্দ আছে। যাঁহারা রাজনারায়ণবাবুর "একাল ও সেকাল" পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, নূতন ইংরাজিশিক্ষা লাভ করিয়া বাঙালী-ছাত্রেরা যখন হিন্দুকালেজ হইতে বাহির হইলেন, তখন তাঁহাদের কিরূপ মত্ততা জন্মিয়াছিল। তাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া গুরুতর আঘাতে হিন্দুসমাজের হৃদয় হইতে রক্তপাত করিয়া তাহাই লইয়া প্রকাশ্যপথে আবীর খেলাইতেন। কঠোর অট্টহাস্য ও নিষ্ঠুর উৎসবের কোলাহল তুলিয়া তখনকার শ্মশানদৃশ্য তাঁহারা আরো ভীষণতর করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকট হিন্দুসমাজের কিছুই ভাল, কিছুই পবিত্র ছিল না। হিন্দুসমাজের যে সকল কঙ্কাল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছিল, তাহাদের ভালরূপ সৎকার করিয়া শেষ ভস্মমুষ্টি গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করিয়া বিষণ্নমনে যে গৃহে ফিরিয়া আসিবেন, প্রাচীন হিন্দুসমাজের স্মৃতির প্রতি তাঁহাদের তত-

টুকুও শ্রদ্ধা ছিল না। তাঁহারা কালভৈরবের অনুচর ভূতপ্রেতের ন্যায় শ্মশানের নরকপালে মদিরাপান করিয়া বিকট উল্লাসে উন্মত্ত হইতেন। সে-সময়কার অবস্থা বিবেচনা করিলে তাঁহাদের ততটা দোষ দেওয়া যায় না। প্রথম বিপ্লবের সময় এইরূপই ঘটিয়া থাকে। একবার ভাঙিবার দিকে মন দিলে প্রলয়ের আনন্দ উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠে। সে সময়ে খানিকটা খারাপ লাগিলেই সমস্তটা খারাপ লাগে, বাহিরটা খারাপ লাগিলেই ভিতরটা খারাপ লাগে। কিন্তু বর্ত্তমান বঙ্গসমাজে বিপ্লবের আগ্নেয়-উচ্ছ্বাস সর্ব্বপ্রথমে যিনি উৎসারিত করিয়া দিলেন—সেই রাম-মোহন রায়—তাঁহার ত এরূপ মত্ততা জন্মে নাই। তিনি ত স্থিরচিত্তে ভালমন্দ সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি আলোক জ্বালাইয়া দিলেন, কিন্তু চিতালোক ত জ্বালান নাই। ইহাই রামমোহন রায়ের প্রধান মহত্ত্ব। কেবলমাত্র বাহ্য অনুষ্ঠান ও জীবন-হীন তন্ত্রমন্ত্রের মধ্যে জীবন্তে সমাহিত হিন্দুধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করিলেন। যে মৃতভারে আচ্ছন্ন হইয়া হিন্দুধর্ম্ম দিনদিন অবসন্ন মুমূর্ষু হইয়া পড়িতেছিল, যে জড় পাষাণস্তূপে পিষ্ট হইয়া হিন্দুধর্ম্মের হৃদয় হতচেতন হইয়া পড়িতেছিল, সেই মৃতভার, সেই জড়স্তূপে রামমোহন রায় প্রচণ্ড-বলে আঘাত করিলেন, তাহার ভিত্তি কম্পিত হইয়া উঠিল, তাহার আপাদমস্তক বিদীর্ণ হইয়া গেল। হিন্দুধর্ম্মের বিপুলায়তন প্রাচীনমন্দির জীর্ণ হইয়া প্রতিদিন ভাঙিয়া পড়িতেছিল, অবশেষে হিন্দুধর্ম্মের দেবপ্রতিমা আর দেখা যাইতেছিল না, কেবল মন্দিরেরই কাষ্ঠ-লোষ্ট্র-ধূলিস্তূপ অত্যন্ত উচ্চ হইয়া উঠিয়াছিল; তাহার গর্ভের মধ্যে অন্ধকার ঘনীভূত হইতে-ছিল, ছোটবড় নানাবিধ সরীসৃপগণ গুহানির্ম্মাণ করিতেছিল, তাহার ইতস্তত প্রতিদিন কণ্টকাকীর্ণ গুল্মসকল উদ্ভিন্ন হইয়া সহস্র শিকড়ের দ্বারা নূতন নূতন বন্ধনে সেই পুরাতন ভগ্নাবশেষকে একত্রে বাঁধিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছিল। হিন্দুসমাজ দেবপ্রতিমাকে ভুলিয়া এই জড়স্তূপে

পূজা করিতেছিল ও পর্ব্বতপ্রমাণ জড়ত্বের তলে পড়িয়া প্রতিদিন চেতনা হারাইতেছিল। রামমোহন রায় সেই ভগ্নমন্দির ভাঙিলেন, সকলে বলিল, তিনি হিন্দুধর্ম্মের উপরে আঘাত করিলেন। কিন্তু তিনিই হিন্দু-ধর্ম্মের জীবনরক্ষা করিলেন। সমস্ত ভারতবর্ষ এইজন্য তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞ। কি সঙ্কটের সময়েই তিনি জন্মিয়াছিলেন। তাঁহার একদিকে হিন্দুসমাজের তটভূমি জীর্ণ হইয়া পড়িতেছিল, আর একদিকে বিদেশীয় সভ্যতাসাগরের প্রচণ্ডবন্যা বিদ্যুদ্‌বেগে অগ্রসর হইতেছিল, রামমোহন রায় তাঁহার অটল মহত্ত্বে মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি যে বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন, খৃষ্টীয়বিপ্লব সেখানে আসিয়া প্রতিহত হইয়া গেল। সে সময়ে তাঁহার মত মহৎ-লোক না জন্মাইলে এতদিন বঙ্গদেশে হিন্দু-সমাজে এক অতি শোচনীয় মহাপ্লাবন উপস্থিত হইত।

এইখানে রামমোহন রায়ের উদারতাসম্বন্ধে হয় ত দুএকটা কথা উঠিতে পারে। ভস্মস্তূপের মধ্যে ঋষিদের হৃদয়জাত যে অমর-অগ্নি প্রচ্ছন্ন ছিল, ভস্ম উড়াইয়া দিয়া তিনি তাহাই বাহির করিয়াছেন। কিন্তু এত করিবার কি প্রয়োজন ছিল? তাহার উত্তর এই—বিজ্ঞানদর্শনের ন্যায় ধর্ম্ম যদি কেবলমাত্র জ্ঞানের বিষয় হইত, হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিবার, লাভ করিবার, সঞ্চয় করিবার বিষয় না হইত, ধর্ম্ম যদি গৃহের অলঙ্কারের ন্যায় কেবল গৃহভিত্তিতে ঝুলাইয়া রাখিবার সামগ্রী হইত, আমাদের সংসারের প্রত্যেক ক্ষুদ্রকাজের প্রবর্ত্তক-নিবর্ত্তক না হইত, তাহা হইলে এরূপ না করিলেও চলিত। তাহা হইলে নানাবিধ বিদেশী অলঙ্কারে গৃহ সাজাইয়া রাখা যাইত। কিন্তু ধর্ম্ম নাকি হৃদয়ে পাইবার ও সংসারের কাজে ব্যবহার করিবার দ্রব্য, দূরে রাখিবার নহে, এইজন্যই স্বদেশের ধর্ম্ম স্বদেশের জন্য বিশেষ উপযোগী। ব্রহ্ম সমস্ত জগতের ঈশ্বর, কিন্তু তিনি বিশেষরূপে ভারতবর্ষেরই ব্রহ্ম। অন্য কোনো দেশের লোকে তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানে না, ব্রহ্ম বলিতে আমরা ঈশ্বরকে

যেরূপভাবে বুঝি, ঈশ্বরের অন্য কোনো বিদেশীয় নামে বিদেশীয়েরা কখনই তাঁহাকে ঠিক সেরূপভাবে বুঝে না। বুঝে বা না বুঝে, জানি না, কিন্তু ব্রহ্ম বলিতে আমাদের মনে যে ভাবের উদয় হইবে, ঈশ্বরের অন্য কোনো বিদেশীয় নামে আমাদের মনে সে ভাব কখনই উদয় হইবে না। ব্রহ্ম একটি কথার কথা নহে, যে ইচ্ছা পাইতে পারে না, যাহাকে ইচ্ছা দেওয়া যায় না। ব্রহ্ম আমাদের পিতামহদের অনেক সাধনার ধন ;—সমস্ত সংসার বিসর্জ্জন দিয়া, সমস্ত জীবন ক্ষেপণ করিয়া, নিভৃত অরণ্যে ধ্যানধারণা করিয়া আমাদের ঋষিরা আমাদের ব্রহ্মকে পাইয়াছিলেন। আমরা তাঁহাদের সেই আধ্যাত্মিক সম্পদের উত্তরাধিকারী। আর কোনো জাতি ঠিক এমন সাধনা করে নাই, ঠিক এমন অবস্থায় পড়ে নাই, এইজন্য ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয় নাই। প্রত্যেক জাতি বিশেষ সাধনা অনুসারে বিশেষ ফল প্রাপ্ত হয়, সেই ফল তাহারা অন্য জাতিকে দান করে। এইরূপে সমস্ত পৃথিবীর উপকার হয়। আমাদের এত সাধনার ফল কি আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক অবহেলা করিয়া ফেলিয়া দিব?

উদ্ভিজ্জ ও পশুমাংসের মধ্যে যে জীবনী শক্তি আছে, তাহা যে আমরা স্বায়ত্ত করিতে পারি, তাহার কারণ, আমাদের নিজের জীবন আছে। আমাদের নিজের প্রাণ না থাকিলে আমরা নূতন প্রাণ উপার্জ্জন করিতে পারি না। আমাদের প্রাণ না থাকিলে উদ্ভিজ্জ, পশু, পক্ষী, কীট প্রভৃতি অন্য প্রাণীরা আমাদিগকে গ্রহণ করিত। এ জগতে মৃত টিকিতে পারে না, জীবিতের মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। রামমোহন রায় যদি দেখিতেন, আমাদের জীবন নাই, তবে পারসীক মৃতদেহের ন্যায় আমাদিগকে মৃতভবনে ফেলিয়া রাখিতে দিতেন, খৃষ্টধর্ম্ম প্রভৃতি অন্যান্য জীবিত প্রাণীর উদরস্থ হইতে দিতেন। কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি চিকিৎসা সুরু করিয়া দিলেন। তিনি দেখিলেন, জীবন আমাদের মধ্যে আচ্ছন্ন হইয়া আছে, তাহাকেই তিনি জাগ্রত করিয়া তুলিলেন।

আমাদের চেষ্টা হউক্‌ আমাদের এই জীবনকে সতেজ করিয়া তুলি, তবে আমরা ক্রমে বিদেশীয় সত্য আপনার করিতে পারিব। এইজন্যই বলি, প্রাচীন ঋষিদের উপনিষদের ব্রহ্মনাম উচ্চারণ করিয়া আমাদের দেশে ঈশ্বরের সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিয়া লই, সার্ব্বভৌমিকতা আপনিই তাহার মধ্যে বিরাজ করিবে। ঈশ্বর যেমন সকলের ঈশ্বর, তেম্‌নি তিনি প্রত্যেকের ঈশ্বর; যেমন তিনি জ্ঞানের ঈশ্বর, তেম্‌নি তিনি হৃদয়ের ঈশ্বর; তিনি যেমন সমস্ত জগতের দেবতা, তেম্‌নি আমাদের গৃহদেবতা। তাঁহাকে রাজা বলিয়াও দেখিতে পারি, তাঁহাকে পিতা বলিয়াও দেখিতে পারি। কিন্তু পিতা ঈশ্বর আমাদের যত নিকটের, তিনি আমাদের হৃদয়ের যত অভাব মোচন করেন, এমন রাজা ঈশ্বর নহেন। তেম্‌নি ব্রহ্মই ভারতবর্ষের সাধনালব্ধ চিরন্তন আশ্রয়, জিহোবা, গড্‌ অথবা আল্লা সেরূপ নহেন। রামমোহন রায় হৃদয়ের উদারতাবশতই ইহা বুঝিয়াছিলেন।

১২৯১

মহর্ষির জন্মোৎসব।*

পূজনীয় পিতৃদেবের আজ অষ্টাশীতিতম সাংবৎসরিক জন্মোৎসব। এই উৎসবদিনের পবিত্রতা আমরা বিশেষভাবে হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করিব।

বহুতর দেশকে সঞ্জীবনস্পর্শে উর্ব্বর করিয়া, পুণ্যধারায় বহুতর গ্রামনগরীর পিপাসা মিটাইয়া, অবশেষে জাহ্নবী যেখানে মহাসমুদ্রের প্রত্যক্ষসম্মুখে আপন সুদীর্ঘ পর্য্যটন অতলস্পর্শ-শান্তির মধ্যে সমাপ্ত করিতে উদ্যত হন, সেই সাগরসঙ্গমস্থল তীর্থস্থান। পিতৃদেবের পূতজীবন অদ্য আমাদের সম্মুখে সেই তীর্থস্থান অবারিত করিয়াছে। তাঁহার

* ৬রা জ্যৈষ্ঠ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জন্মোৎসবে পঠিত।

পুণ্যকর্ম্মরত দীর্ঘজীবনের একাগ্রধারা অন্ত যেখানে তটহীন, সীমাশূন্য, বিপুল বিরামসমুদ্রের সম্মুখীন হইয়াছে, সেইখানে আমরা ক্ষণকালের জন্য নতশিরে স্তব্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইব। আমরা চিন্তা করিয়া দেখিব, বহুকাল পূর্ব্বে একদিন স্বর্গ হইতে কোন্ শুভ সূর্য্যকিরণের আঘাতে অকস্মাৎ সুপ্তি হইতে জাগ্রত হইয়া কঠিন তুষারবেষ্টনকে অশ্রুধারায় বিগলিত করিয়া এই জীবন আপন কল্যাণযাত্রা আরম্ভ করিয়াছিল—তখন ইহার ক্ষীণ স্বচ্ছধারা কখনো আলোক, কখনো অন্ধকার, কখনো আশা, কখনো নৈরাশ্যের মধ্য দিয়া দুর্গম পথ কাটিয়া কাটিয়া চলিতেছিল। বাধা প্রতিদিন বৃহদাকার হইয়া দেখা দিতে লাগিল—কঠিন প্রস্তরপিণ্ড-সকল পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল—কিন্তু সে সকল বাধায় স্রোতকে রুদ্ধ না করিতে পারিয়া দ্বিগুণবেগে উদ্বেল করিয়া তুলিল—দুঃসাধ্য দুর্গমতা সেই দুর্ব্বার বলের নিকট মস্তক নত করিয়া দিল। এই জীবনধারা ক্রমশ বৃহৎ হইয়া, বিস্তৃত হইয়া লোকালয়ের মধ্যে অবতরণ করিল, দুই কূলকে নবজীবনে অভিষিক্ত করিয়া চলিল, বাধা মানিল না, বিশ্রাম করিল না, কিছুতেই তাহাকে লক্ষ্য হইতে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিল না—অবশেষে আজ সেই একনিষ্ঠ অনন্যপরায়ণ জীবনস্রোত সংসারের দুই কূলকে আচ্ছন্ন করিয়া অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে—আজ সে তাহার সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত চাঞ্চল্যকে পরমপরিণামের সম্মুখে প্রশান্ত করিয়া পরিপূর্ণ আত্মবিসর্জ্জনের দিকে আপনাকে প্রসারিত করিয়াছে—অনন্ত জীবনসমুদ্রের সহিত সার্থক জীবনধারার এই সুগম্ভীর সম্মিলনদৃশ্য অদ্য আমাদের ধ্যাননেত্রের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হইয়া আমাদিগকে ধন্য করুক্।

অমৃতপিপাসা ও অমৃতসন্ধানের পথে ঐশ্বর্য্য একটি প্রধান অন্তরায়। সামান্য সোনার প্রাচীর উচ্চ হইয়া উঠিয়া আমাদের দৃষ্টি হইতে অনন্ত আকাশের অমৃত-আলোককে রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইতে পারে। ধন-সম্পদের মধ্যেই দীনহৃদয় আপনার সার্থকতা উপলব্ধি করিতে থাকে—

সে বলে, এই ত আমি কৃতার্থ হইয়াছি, দশে আমার স্তব করিতেছে, দেশে আমার প্রতাপ বিকীর্ণ হইতেছে, বাহিরে আমার আড়ম্বর অভ্রভেদ করিতেছে, ঘরে আমার আরামশয়ন প্রতিদিন স্তরে স্তরে রাশীকৃত হইয়া উঠিতেছে, আমার আর কি চাই! হায় রে দরিদ্র, নিখিল মানবের অন্তরাত্মা যখন ক্রন্দন করিয়া উঠিয়াছে—যাহাতে আমি অমর না হইব, তাহা লইয়া আমি কি করিব—

"যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্"—

সপ্তলোক যখন অন্তরীক্ষে ঊর্দ্ধকররাজি প্রসারিত করিয়া প্রার্থনা করিতেছে, আমাকে সত্য দাও, আলোক দাও, অমৃত দাও, অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়—তখন তুমি বলিতেছ আমার ধন আছে, আমার মান আছে, আমার আরাম আছে, আমি প্রভু, আমি অধিপতি, আমার আর কি চাই! ঐশ্বর্য্যের ইহাই বিড়ম্বনা —দীনাত্মার কাছে ঐশ্বর্য্যই চরমসার্থকতার রূপ ধারণ করে। অদ্যকার উৎসবে আমরা যাঁহার মাহাত্ম্য স্মরণ করিবার জন্য সমবেত হইয়াছি— একদা প্রথমযৌবনেই তাঁহার অধ্যাত্মদৃষ্টি এই কঠিন ঐশ্বর্য্যের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর অতিক্রম করিয়া অনন্তের দিকে উন্মীলিত হইয়াছিল—যখন তিনি ধনমানের দ্বারা নীরন্ধ্রভাবে আবৃত-আচ্ছন্ন ছিলেন, তখনি ধনসম্পদের স্থূলতম আবরণ ভেদ করিয়া, স্তাবকগণের বন্দনাগানকে অধঃকৃত করিয়া, আরাম-আমোদ-আড়ম্বরের ঘন যবনিকা বিচ্ছিন্ন করিয়া, এই অমৃতবাণী তাঁহার কর্ণে কেমন করিয়া প্রবেশলাভ করিল যে, ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং— যাহা-কিছু সমস্তকেই ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছন্ন দেখিবে, ধনের দ্বারা নহে, স্বার্থের দ্বারা নহে, আত্মাভিমানের দ্বারা নহে—যিনি ঈশানং ভূতভব্যস্য—যিনি আমাদের অনন্তকালের ঈশ্বর, আমাদের ভূতভবিষ্যতের প্রভু—তাঁহাকে এই ধনিসন্তান কেমন করিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে ঐশ্বর্য্যপ্রভাবের ঊর্দ্ধে, সমস্ত প্রভুত্বের উচ্চে আপনার একমাত্র প্রভু বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতে পারিলেন

—সংসারের মধ্যে তাঁহার নিজের প্রভুত্ব, সমাজের মধ্যে তাঁহার ধনমর্য্যাদার সম্মান—তাঁহাকে অন্ধ করিয়া রাখিতে পারিল না।

আবার যে দিন এই প্রভূত ঐশ্বর্য্য অকস্মাৎ এক দুর্দ্দিনের বজ্রাঘাতে বিপুল আয়োজন-আড়ম্বর লইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে সশব্দে ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল—ঋণ যখন মুহূর্ত্তের মধ্যেই বৃহদাকার ধারণ করিয়া তাঁহার গৃহদ্বার, তাঁহার সুখসমৃদ্ধি, তাঁহার অশনবসন, সমস্তই গ্রাস করিবার উপক্রম করিল তখনো পদ্ম যেমন আপন মৃণালবৃন্ত দীর্ঘতর করিয়া জলপ্লাবনের ঊর্দ্ধে আপনাকে সূর্য্যকিরণের দিকে নির্ম্মল সৌন্দর্য্যে উন্মেষিত করিয়া রাখে, তেম্নি করিয়া তিনি সমস্ত বিপদ্‌বন্যার ঊর্দ্ধে আপনার অম্লানহৃদয়কে ধ্রুবজ্যোতির দিকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া রাখিলেন। সম্পদ্ যাহাকে অমৃতলাভ হইতে তিরস্কৃত করিতে পারে নাই, বিপদ্‌ও তাঁহাকে অমৃতসঞ্চয় হইতে বঞ্চিত করিতে পারিল না। সেই দুঃসময়কেই তিনি আত্মজ্যোতির দ্বারা সুসময় করিয়া তুলিয়াছিলেন—যখন তাঁহার ধনসম্পদ্ ধূলিশায়ী, তখনই তিনি তাঁহার দৈন্যের ঊর্দ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া পরমাত্মসম্পদ্‌বিতরণের উপলক্ষ্যে সমস্ত ভারতবর্ষকে মুহুর্মুহু আহ্বান করিতেছিলেন। সম্পদের দিনে তিনি ভুবনেশ্বরের দ্বারে রিক্তহস্তে ভিক্ষু হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, বিপদের দিনে তিনি আত্মৈশ্বর্য্যের গৌরবে ব্রহ্মসত্র খুলিয়া বিশ্বপতির প্রসাদসুধাবণ্টনের ভারগ্রহণ করিয়াছিলেন।

ঐশ্বর্য্যের সুখশয্যা হইতে তুলিয়া লইয়া ধর্ম্ম ইঁহাকে তাহার পথের মধ্যে দাঁড় করাইয়া দিল—ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি—কবিরা বলেন, সেই পথ ক্ষুরধারনিশিত অতি দুর্গম পথ। লোকাচারপ্রচলিত চিরাভ্যস্ত ধর্ম্ম, আরামের ধর্ম্ম, তাহা অন্ধভাবে, জড়-ভাবেও পালন করিয়া যাওয়া চলে এবং তাহা পালন করিয়া লোকের নিকট সহজেই যশোলাভ করিতে পারা যায়। ধর্ম্মের সেই আরাম, সেই

সম্মানকেও পিতৃদেব পরিহার করিয়াছিলেন। ক্ষুরধারনিশিত দুরতিক্রম্য পথেই তিনি নির্ভয়ে পদনিক্ষেপ করিলেন। লোকসমাজের আনুগত্য করিতে গিয়া তিনি আত্মবিদ্রোহী, আত্মঘাতী হইলেন না।

ধনিগৃহে যাঁহাদের জন্ম, পৈতৃককাল হইতেই সমাজের নিকট সম্মানলাভে যাঁহারা অভ্যস্ত, সমাজপ্রচলিত সংস্কারের নিবিড়ব্যূহ ভেদ করিয়া নিজের অন্তর্লব্ধ সত্যের পতাকাকে শত্রুমিত্রের ধিক্কার, লাঞ্ছনা ও প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে অবিচলিত দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ করিয়া রাখা তাঁহাদের পক্ষে কোনোমতেই সহজ নহে—বিশেষত বৈষয়িক সঙ্কটের সময় সকলের আনুকূল্য যখন অত্যাবশ্যক হইয়া উঠে, তখন তাহা যে কিরূপ কঠিন, সে কথা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। সেই তরুণবয়সে, বৈষয়িক দুর্যোগের দিনে, সম্ভ্রান্তসমাজে তাঁহার যে বংশগত প্রভূত প্রতিপত্তি ছিল, তাহার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, পিতৃদেব ভারতবর্ষের ঋষিবন্দিত চিরন্তন ব্রহ্মের, সেই অপ্রতিম দেবাধিদেবের আধ্যাত্মিক পূজা প্রতিকূল সমাজের নিকট মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন।

তাহার পরে তাঁহার জীবনে আর এক গুরুতর সংগ্রামের দিন উপস্থিত হইল। সকলেই জানেন, বৈচিত্র্যই জগতে ঐক্যকে প্রমাণ করে—বৈচিত্র্য যতই সুনির্দ্দিষ্ট হয়, ঐক্য ততই সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। ধর্ম্মও সেইরূপ নানাসমাজের ইতিহাসকে আশ্রয় করিয়া নানা বিভিন্নকণ্ঠে নানা বিচিত্র আকারে এক নিত্যসত্যকে চারিদিক্ হইতে সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছে। ভারতবর্ষ বিশেষসাধনায় বিশেষভাবে যাহা লাভ করিয়াছে, তাহার ভারতবর্ষীয় আকার বিলুপ্ত করিয়া, তাহাকে ভারতবর্ষের ইতিহাস হইতে উৎপাটিত করিয়া, তাহাকে অন্যদেশীয় আকৃতি-প্রকৃতির সহিত মিশ্রিত করিয়া দিবার চেষ্টা করিলে জগতের ঐক্যমূলক বৈচিত্র্যের ধর্ম্মকে লঙ্ঘন করা হয়। প্রত্যেক লোক যখন আপনার প্রকৃতি অনুসারে পরিপূর্ণ উৎকর্ষ লাভ করে, তখনই সে মনুষ্যত্বলাভ

করে—সাধারণ মনুষ্যত্ব ব্যক্তিগত বিশেষত্বের ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। মনুষ্যত্ব হিন্দুর মধ্যে এবং খৃষ্টানের মধ্যে বস্তুত একই, তথাপি হিন্দুবিশেষত্ব মনুষ্যত্বের একটি বিশেষ সম্পদ্, এবং খৃষ্টান-বিশেষত্বও মনুষ্যত্বের একটি বিশেষ লাভ; তাহার কোনোটা সম্পূর্ণ বর্জ্জন করিলে মনুষ্যত্ব দৈন্যপ্রাপ্ত হয়। ভারতবর্ষের যাহা শ্রেষ্ঠধন তাহাও সার্ব্বভৌমিক, য়ুরোপের যাহা শ্রেষ্ঠধন তাহাও সার্ব্বভৌমিক, তথাপি ভারতবর্ষীয়তা এবং য়ুরোপীয়তা উভয়ের স্বতন্ত্র সার্থকতা আছে বলিয়া উভয়কে একাকার করিয়া দেওয়া চলে না। মেঘ আকাশ হইতে জলবর্ষণ করে এবং সরোবর ভূতলে থাকিয়া জলদান করে—যদিও দানের সামগ্রী একই, তথাপি এই পার্থক্যবশতই মেঘ আপন প্রকৃতি অনুসারে বিশেষভাবে ধন্য এবং সরোবরও আপন প্রকৃতি অনুসারে বিশেষভাবে কৃতার্থ। ইহারা উভয়ে এক হইয়া গেলে জলের পরিমাণ মোটের উপরে কমে না, কিন্তু জগতে ক্ষতির কারণ ঘটে।

তরুণ ব্রাহ্মসমাজ যখন পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রভাবে এই কথা ভুলিয়াছিল, যখন ধর্ম্মের স্বদেশীয় রূপ রক্ষা করাকে সে সঙ্কীর্ণতা বলিয়া জ্ঞান করিত—যখন সে মনে করিয়াছিল, বিদেশীয় ইতিহাসের ফল ভারতবর্ষীয় শাখায় ফলাইয়া তোলা সম্ভবপর এবং সেই চেষ্টাতেই যথার্থভাবে ঔদার্য্য-রক্ষা হয়, তখন পিতৃদেব সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের স্বদেশীয় প্রকৃতিকে একটা বিমিশ্রিত একাকারত্বের মধ্যে বিসর্জ্জন দিতে অস্বীকার করিলেন—ইহাতে তাঁহার অনুবর্ত্তী অসামান্য প্রতিভাশালী ধর্ম্মোৎসাহী অনেক তেজস্বী যুবকের সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ ঘটিল। এই বিচ্ছেদ স্বীকার করিতে যে দৃঢ়তা, যে সাহস, যে বলের প্রয়োজন হয়, সমস্ত মতামতের কথা বিস্মৃত হইয়া আজ তাহাই যেন আমরা স্মরণ করি। আধুনিক হিন্দুসমাজের প্রচলিত লোকাচারের প্রবল প্রতিকূলতার মুখে আপন অনুবর্ত্তী সমাজের ক্ষমতাশালী সহায়গণকে পরিত্যাগ করিয়া

নিজেকে সকল দিক্‌ হইতেই রিক্ত করিতে কে পারে—যাঁহার অন্তঃকরণ জগতের আদিশক্তির অক্ষয় নির্ঝরধারায় অহরহ পূর্ণ হইয়া না উঠিতেছে।

ইঁহাকে যেমন আমরা সম্পদে-বিপদে অভয় আশ্রয়ে অবিচলিত দেখিয়াছি—তেম্‌নি একবার বর্ত্তমান সমাজের প্রতিকূলে, আর একবার হিন্দুসমাজের অনুকূলে তাঁহাকে সত্যে-বিশ্বাসে দৃঢ় থাকিতে দেখিলাম —দেখিলাম, উপস্থিত গুরুতর ক্ষতির আশঙ্কা তাঁহাকে টলাইতে পারিল না—হিন্দুসমাজের মধ্যে তিনি পরম দুর্দ্দিনেও একাকী দাঁড়াইয়াছিলেন, ব্রাহ্মসমাজে তিনি নব আশা, নব উৎসাহের অভ্যুদয়ের মুখে পুনর্ব্বার সমস্ত ত্যাগ করিয়া একাকী দাঁড়াইলেন। তাঁহার কেবল এই প্রার্থনা রহিল, মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ—আমি ব্রহ্মকে ত্যাগ করিলাম না, ব্রহ্ম আমাকে ত্যাগ না করুন!

ধনসম্পদের স্বর্ণস্তূপরচিত ঘনান্ধকার ভেদ করিয়া, নবযৌবনের অপরিতৃপ্ত প্রবৃত্তির পরিবেষ্টনের মধ্যে দিব্যজ্যোতি যাঁহার ললাটস্পর্শ করিয়াছিল, ঘনীভূত বিপদের ভ্রূকুটীকুটিল রুদ্রচ্ছায়ায় আসন্ন দারিদ্র্যের উদ্যত বজ্রদণ্ডের সম্মুখেও ঈশ্বরের প্রসন্ন মুখচ্ছবি যাঁহার অনিমেষ অন্তর্দৃষ্টির সম্মুখে অচঞ্চল ছিল, দুর্দ্দিনের সময়েও সমস্ত লোকভয় অতিক্রম করিয়া যাঁহার কর্ণে ধর্ম্মের 'মা ভৈঃ' বাণী সুস্পষ্ট ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল, বলবুদ্ধি-দলপুষ্টির মুখে যিনি বিশ্বাসের বলে সমস্ত সহায় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নিঃসঙ্কোচে পরমসহায়ের আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিলেন, অদ্য তাঁহার পুণ্যচেষ্টাভূয়িষ্ঠ সুদীর্ঘ জীবনদিনের সায়াহ্নকাল সমাগত হইয়াছে। অদ্য তাঁহার ক্লান্তকণ্ঠের স্বর ক্ষীণ, কিন্তু তাঁহার সম্পূর্ণপ্রায় জীবনের নিঃশব্দবাণী সুস্পষ্টতর, অদ্য তাঁহার ইহজীবনের কর্ম্ম সমাপ্ত, কিন্তু তাঁহার জীবনব্যাপী কর্ম্মচেষ্টার মূলদেশ হইতে যে একাগ্রনিষ্ঠা ঊর্দ্ধলোকে উঠিয়াছে, তাহা আজ নিস্তব্ধভাবে প্রকাশমান। অদ্য তিনি তাঁহার এই বৃহৎ সংসারের বহির্দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, কিন্তু সংসারের সমস্ত

সুখদুঃখ-বিচ্ছেদমিলনের মধ্যে যে অচলা শান্তি জননীর আশীর্ব্বাদের ন্যায় চিরদিন তাঁহার অন্তরে ধ্রুব হইয়া ছিল, তাহা দিনান্তকালের রমণীয় সূর্য্যাস্তচ্ছটার ন্যায় অদ্য তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া উদ্ভাসিত। কর্ম্মশালায় তিনি তাঁহার জীবনেশ্বরের আদেশপালন করিয়া অদ্য বিরামশালায় তিনি তাঁহার হৃদয়েশ্বরের সহিত নির্ব্বাধমিলনের পথে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। এই পুণ্যক্ষণে আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিবার জন্য, তাঁহার সার্থকজীবনের শান্তিসৌন্দর্য্যমণ্ডিত শেষ রশ্মিচ্ছটা মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিবার জন্য, এখানে সমাগত হইয়াছি।

বন্ধুগণ, যাঁহার জীবন আপনাদের জীবনশিখাকে ক্ষণে ক্ষণে উজ্জ্বল করিয়াছে, যাঁহার বাণী অবসাদের সময় আপনাদিগকে বল ও বিষাদের সময় আপনাদিগকে সান্ত্বনা দিয়াছে, তাঁহার জন্মদিনকে উৎসবের দিন করিয়া আপনারা ভক্তিকে চরিতার্থ করিতে আসিয়াছেন, এইখানে আমি আমার পুত্রসম্বন্ধ লইয়া এই উৎসবদিনে যদি ক্ষণকালের জন্য পিতার নিকট বিশেষভাবে উপস্থিত হই, তবে আমাকে মার্জ্জনা করিবেন। সন্নিকটবর্ত্তী মহাত্মাকে সমগ্রভাবে, সম্পূর্ণভাবে দেখিবার অবসর আত্মীয়দের প্রায় ঘটে না। সংসারের সম্বন্ধ বিচিত্র সম্বন্ধ, বিচিত্র স্বার্থ, বিচিত্র মত, বিচিত্র প্রবৃত্তি—ইহার দ্বারা বিচারশক্তির বিশুদ্ধতা রক্ষা করা কঠিন হয়, ছোট জিনিষ বড় হইয়া উঠে, অনিত্যজিনিষ নিত্যজিনিষকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, সংসারের নানা ঘাতপ্রতিঘাতে প্রকৃত পরিচয় প্রত্যহ খণ্ডিত হইয়া যায়—এইজন্যই পিতৃদেবের এই জন্মদিনের উৎসব তাঁহার আত্মীয়দের পক্ষে একটি বিশেষ শুভ অবসর—যে-পরিমাণ দূরে দাঁড়াইলে মহত্ত্বকে আদ্যোপান্ত অখণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়, অদ্যকার এই উৎসবের সুযোগে বাহিরের ভক্তমণ্ডলীর সহিত একাসনে বসিয়া আমরা সেইপরিমাণ দূরে আসিব, তাঁহাকে ক্ষুদ্র সংসারের সমস্ত তুচ্ছ সম্বন্ধজাল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিব, আমাদের সঙ্কীর্ণ জীবনের

প্রাত্যহিক ব্যবহারোৎক্ষিপ্ত সমস্ত ধূলিরাশিকে অপসারিত করিয়া তাঁহাকে বৃহৎ আকাশের মধ্যে, নির্ম্মল শান্তির মধ্যে, দেবপ্রসাদের অক্ষুণ্ণ আনন্দ-রশ্মির মধ্যে, তাঁহার যথার্থ মহিমায় তাঁহাকে তাঁহার জীবনের নিত্য-প্রতিষ্ঠার উপরে সমাসীন দেখিব। সংসারের আবর্ত্তে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া যত বিদ্রোহ, যত চপলতা, যত অন্যায় করিয়াছি, অদ্য তাহার জন্য তাঁহার শ্রীচরণে একান্তচিত্তে ক্ষমাপ্রার্থনা করিব—আজ তাঁহাকে আমা-দের সংসারের, আমাদের সর্ব্বপ্রয়োজনের অতীত করিয়া তাঁহাকে বিশ্বভুবনের ও বিশ্বভুবনেশ্বরের সহিত বৃহৎ নিত্যসম্বন্ধে যুক্ত করিয়া দেখিব এবং তাঁহার নিকট এই আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিব যে, যে চিরজীবনের ধনকে তিনি নিজের জীবনের মধ্যে সঞ্চিত করিয়াছেন, সেই সঞ্চয়কেই যেন আমরা সর্ব্বপ্রধান পৈতৃকসম্পত্তি বলিয়া গণ্য করি, তাঁহার জীবনের দৃষ্টান্ত যেন আমাদিগকে ধনসম্পদের অন্ধতা হইতে রক্ষা করে, বিপদের বিভীষিকা হইতে উদ্ধার করে, বিশ্বাসের দৃঢ়তার মধ্যে আমাদিগকে ধারণ করিয়া রাখে এবং তিনি ঋষিদের যে মন্ত্র আমাদের কর্ণে ধ্বনিত করিয়া-ছেন, তাহা যেন কোনো আরামের জড়ত্বে, কোনো নৈরাশ্যের অবসাদে বিস্মৃত না হই—

নাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ।
অনিরাকরণমস্তু অনিরাকরণং মেহস্তু।

বন্ধুগণ, ভ্রাতৃগণ, এই সপ্তাশীতিবর্ষীয় জীবনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আন-ন্দিত হও, আশান্বিত হও। ইহা জান যে, সত্যমেব জয়তে নানৃতম্—ইহা জান যে, ধর্ম্মই ধর্ম্মের সার্থকতা। ইহা জান যে, আমরা যাহাকে সম্পদ্ বলিয়া উন্মত্ত হই, তাহা সম্পদ্ নহে; যাহাকে বিপদ্ বলিয়া ভীত হই, তাহা বিপদ্ নহে; আমাদের অন্তরাত্মা সম্পদ্‌বিপদের অতীত যে পরমা শান্তি, তাহাকে আশ্রয় করিবার অধিকারী। ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ—সমস্ত জীবন দিয়া ভূমাকেই জানিতে ইচ্ছা কর, এবং সমস্ত জীবনের মধ্যে

ভূমাকেই সপ্রমাণ কর। এই প্রার্থনা কর, আবিরাবীর্ম্ম এধি—হে স্বপ্রকাশ, আমার নিকটে প্রকাশিত হও—আমার নিকটে প্রকাশিত হইলে সেই প্রকাশ আমাকে অতিক্রম করিয়া সমস্ত মানবের নিকট সহজে দীপ্যমান হইয়া উঠিবে—এইরূপে আমার জীবন সমস্ত মানবের নিত্যজীবনের মধ্যে উৎসর্গীকৃত হইয়া থাকিবে; আমার এই কয়দিনের মানবজন্ম চিরদিনের জন্য সার্থক হইবে!

১৩১১

মহর্ষির আত্মকৃত্য উপলক্ষ্যে প্রার্থনা।

"হে পরমপিতঃ, হে পিতৃতমঃ পিতৃণাম্, এ সংসারে যাঁহার পিতৃভাবের মধ্য দিয়া তোমাকে পিতা বলিয়া জানিয়াছি—অদ্য একাদশ দিন হইল, তিনি ইহলোক হইতে অবসৃত হইয়াছেন। তাঁহার সমস্ত জীবন হোম-হুতাশনের উর্দ্ধমুখী পবিত্র শিখার ন্যায় তোমার অভিমুখে নিয়ত উত্থিত হইয়াছে। অদ্য তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনযাত্রার অবসানে তুমি তাঁহাকে কি শান্তিতে, কি অমৃতে অভিষিক্ত করিয়াছ—যিনি স্বর্গকামনা করেন নাই, কেবল "ছায়াতপয়োরিব" ব্রহ্মলোকে তোমার সহিত যুক্ত হইবার জন্য যাঁহার চরমাকাঙ্ক্ষা ছিল, অদ্য তাঁহাকে তুমি কিরূপ সুধাময় চরিতার্থতার মধ্যে বেষ্টন করিয়াছ, তাহা আমাদের মননের অগোচর, তথাপি হে মঙ্গলময়, তোমার পরিপূর্ণ মঙ্গল-ইচ্ছার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাসস্থাপন করিয়া তোমাকে বারবার নমস্কার করি। তুমি অনন্তসত্য, তোমার মধ্যে আমাদের সমস্ত সত্যচিন্তা নিঃশেষে সার্থক হয়,—তুমি অনন্তকল্যাণ, তোমার মধ্যে আমাদের সমস্ত শুভকর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে সফল হয়,—আমাদের সমস্ত অকৃত্রিম প্রেম, হে আনন্দস্বরূপ, তোমারই মধ্যে সুন্দরভাবে ধন্য

হয়,—আমাদের পিতৃদেবের জীবনের সমস্ত সত্য, সমস্ত মঙ্গল, সমস্ত প্রেম তোমার মধ্যে অনির্ব্বচনীয়রূপে পরিপূর্ণ হইয়াছে, ইহা জানিয়া আমরা ভ্রাতাভগিনীগণ করজোড়ে তোমার জয়োচ্চারণ করিতেছি।

পৃথিবীতে অধিকাংশ সম্বন্ধই দানপ্রতিদানের অপেক্ষা রাখে—কিন্তু পিতামাতার স্নেহ প্রতিদানপ্রত্যাশার অতীত। তাহা পাপ, অপরাধ, কদর্য্যতা, কৃতঘ্নতা, সমস্তকেই অতিক্রম করিয়া আপনাকে প্রকাশ করে। তাহা ঋণ নহে, তাহা দান। তাহা আলোকের ন্যায়, সমীরণের ন্যায়—তাহা শিশুকাল হইতে আমাদিগকে নিয়ত রক্ষা করিয়াছে, কিন্তু তাহার মূল্য কেহ কখনো চাহে নাই। পিতৃস্নেহের সেই অযাচিত, সেই অপর্য্যাপ্ত মঙ্গলের জন্য, হে বিশ্বপিতঃ, আজ তোমাকে প্রণাম করি।

আজ প্রায় পঞ্চাশবৎসর অতীত হইল, আমাদের পিতামহের মৃত্যুর পরে এই গৃহের উপরে সহসা ঋণরাশিভারাক্রান্ত কি দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা সকলেই জানেন। পিতৃদেব একাকী বহুবিধ প্রতিকূলতার মধ্যে দুস্তর ঋণসমুদ্র সন্তরণপূর্ব্বক কেমন করিয়া যে কূলে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন—আমাদের অদ্যকার অন্নবস্ত্রের সংস্থান কেমন করিয়া যে তিনি ধ্বংসের মুখ হইতে বাঁচাইয়া আমাদের জন্য রক্ষা করিয়াছেন, আজ তাহা আমাদের পক্ষে কল্পনা করাও কঠিন। সেই ঝঞ্চার ইতিহাস আমরা কি জানি! কতকাল ধরিয়া তাঁহাকে কি দুঃখ, কি চিন্তা, কি চেষ্টা, কি দশাবিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া প্রতিদিন, প্রতিরাত্রি যাপন করিতে হইয়াছে, তাহা মনে করিতে গেলে শরীর কণ্টকিত হয়। তিনি অতুল বৈভবের মধ্যে লালিতপালিত হইয়াছিলেন—অকস্মাৎ ভাগ্যপরিবর্ত্তনের সম্মুখে কেমন করিয়া তিনি অবিচলিত বীর্য্যের সহিত দণ্ডায়মান হইলেন! যাহারা অপর্য্যাপ্ত ধনসম্পদ্ ও বাধাহীন ভোগসুখের মধ্যে মানুষ হইয়া উঠে, দুঃখসংঘাতের অভাবে, বিলাসলালিত্যের সংবেষ্টনে বাল্যকাল হইতে যাহাদের শক্তির চর্চ্চা অসম্পূর্ণ, সঙ্কটের সময় তাহাদের মত অসহায় কে

আছে! বাহিরের বিপদের অপেক্ষা নিজের অপরিণত চারিত্রবল ও অসংযত প্রবৃত্তি তাহাদের পক্ষে গুরুতর শত্রু। এই সময়ে এই অবস্থায় যে ধনপতির পুত্র নিজের চিরাভ্যাসকে খর্ব্ব করিয়া, ধনিসমাজের প্রভূত প্রতিপত্তিকে তুচ্ছ করিয়া শান্তসংযত শৌর্য্যের সহিত এই সুবৃহৎ পরিবারকে স্কন্ধে লইয়া দুঃসহ দুঃসময়ের বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়াছেন ও জয়ী হইয়াছেন, তাঁহার সেই অসামান্য বীর্য্য, সেই সংযম, সেই দৃঢ়চিত্ততা, সেই প্রতিমুহূর্ত্তের ত্যাগস্বীকার আমরা মনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধিই বা করিব কি করিয়া এবং তদনুরূপ কৃতজ্ঞতাই বা কেমন করিয়া অনুভব করিব! আমাদের অদ্যকার সমস্ত অন্ন-বস্ত্র-আশ্রয়ের পশ্চাতে তাঁহার সেই বিপত্তিতে অকম্পিত বলিষ্ঠ দক্ষিণহস্ত ও সেই হস্তের মঙ্গল আশিষস্পর্শ আমরা যেন নিয়ত নম্রভাবে অনুভব করি।

আমাদের সর্ব্বপ্রকার অভাবমোচনের পক্ষে প্রচুর এই যে সম্পত্তি তিনি সম্পূর্ণ নিজের বলে রক্ষা করিয়াছেন, ইহা যদি অধর্ম্মের সহায়তায় ঘটিত, তবে অদ্য অন্তর্যামীর সম্মুখে সেই পিতার নিকটে শ্রদ্ধানিবেদন করিতে আমাদিগকে কুণ্ঠিত হইতে হইত। সর্ব্বাগ্রে তিনি ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়া পরে তিনি ধনরক্ষা করিয়াছেন—অদ্য আমরা যাহা লাভ করিয়াছি, তাহার সহিত তিনি অসত্যের গ্লানি মিশ্রিত করিয়া দেন নাই—আজ আমরা যাহা ভোগ করিতেছি, তাহাকে দেবতার প্রসাদস্বরূপ নির্ম্মলচিত্তে নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করিবার অধিকারী হইয়াছি।

সেই বিপদের দিনে তাঁহার বিষয়ী বন্ধুর অভাব ছিল না—তিনি ইচ্ছা করিলে হয় ত কৌশলপূর্ব্বক তাঁহার পূর্ব্বসম্পত্তির বহুতর অংশ এমন করিয়া উদ্ধার করিতে পারিতেন যে, ধনগৌরবে বঙ্গীয় ধনীদের ঈর্ষাভাজন হইয়া থাকিতেন। তাহা করেন নাই বলিয়া আজ যেন আমরা তাঁহার নিকটে দ্বিগুণতর কৃতজ্ঞ হইতে পারি।

ঘোর সঙ্কটের সময় একদিন তাঁহার সম্মুখে একইকালে শ্রেয়ের পথ

ও প্রেয়ের পথ উদ্‌ঘাটিত হইয়াছিল। তখন সর্ব্বস্ব হারাইবার সম্ভাবনা তাঁহার সম্মুখে ছিল—তাঁহার স্ত্রীপুত্র ছিল, তাঁহার মানসম্ভ্রম ছিল, তৎসত্ত্বে যেদিন তিনি শ্রেয়ের পথ নির্ব্বাচন করিয়া লইলেন, সেই মহা-দিনের কথা আজ যেন আমরা একবার স্মরণ করিবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমাদের বিষয়লালসার তীব্রতা শান্ত হইয়া আসিবে এবং সন্তোষের অমৃতে আমাদের হৃদয় অভিষিক্ত হইবে। অর্জ্জনের দ্বারা তিনি যাহা আমাদিগকে দিয়াছেন, তাহা আমরা গ্রহণ করিয়াছি; বর্জ্জনের দ্বারা তিনি যাহা আমাদিগকে দিয়াছেন, তাহাও যেন গৌরবের সহিত গ্রহণ করিবার যোগ্য আমরা হইতে পারি।

তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ ছিলেন,—কিন্তু তিনি যদি শুদ্ধমাত্র বিষয়ী হইতেন, তবে তাঁহার উদ্ধারপ্রাপ্ত সম্পত্তিখণ্ডকে উত্তরোত্তর সঞ্চয়ের দ্বারা বহুলরূপে বিস্তৃত করিতে পারিতেন। কিন্তু বিষয়বিস্তারের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ঈশ্বরের সেবাকে তিনি বঞ্চিত করেন নাই। তাঁহার ভাণ্ডার ধর্ম্মপ্রচারের জন্য মুক্ত ছিল—কত অনাথ পরিবারের তিনি আশ্রয় ছিলেন, কত দরিদ্র গুণীকে তিনি অভাবের পেষণ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, দেশের কত হিতকর্ম্মে তিনি বিনা আড়ম্বরে গোপনে সাহায্য দিয়াছেন। এইদিকে কৃপণতা করিয়া তিনি কোনোদিন তাঁহার সন্তান-দিগকে বিলাসভোগ বা ধনাভিমানচর্চ্চায় প্রশ্রয় দেন নাই;—ধর্ম্মপরায়ণ গৃহস্থ যেমন সমস্ত অতিথিবর্গের আহারশেষে নিজে ভোজন করেন, তিনি সেইরূপ তাঁহার ভাণ্ডারদ্বারের সমস্ত অতিথিবর্গের পরিবেষণশেষ লইয়া নিজের পরিবারকে প্রতিপালন করিয়াছেন। এইরূপে তিনি আমাদিগকে ধনসম্পদের মধ্যে রাখিয়াও আড়ম্বর ও ভোগোন্মত্ততার হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন, এবং এইরূপে যদি তাঁহার সন্তানগণের সম্মুখ হইতে লক্ষ্মীর স্বর্ণপিঞ্জরের অবরোধদ্বার কিছুমাত্র শিথিল হইয়া থাকে, যদি তাঁহারা ভাবলোকের মুক্ত-আকাশে অবাধবিহারের কিছুমাত্র

অধিকারী হইয়া থাকেন, তাব নিশ্চয়ই তাঁহারা পিতার পুণ্যপ্রসাদে বহুতর লক্ষপতির অপেক্ষা সৌভাগ্যবান্ হইয়াছেন।

আজ এই কথা বলিয়া আমরা সকলের কাছে গৌরব করিতে পারি যে, এতকাল আমাদের পিতা যেমন আমাদিগকে দারিদ্র্য হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, তেম্‌নি ধনের গণ্ডীর মধ্যেও আমাদিগকে বদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। পৃথিবী আমাদেব সম্মুখে মুক্ত ছিল—ধনিদরিদ্র সকলেরই গৃহে আমাদের যাতায়াতের পথ সমান প্রশস্ত ছিল। সমাজে যাঁহাদের অবস্থা আমাদের অপেক্ষা হীন ছিল, তাঁহারা সুহৃদ্‌ভাবেই আমাদের পরিবারে অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হইয়াছেন, পারিষদভাবে নহে—ভবিষ্যতে আমরা ভ্রষ্ট হইতে পারি, কিন্তু আমরা ভ্রাতাগণ দারিদ্র্যের অসম্মানকে এই পরিবারের ধর্ম্ম বলিয়া জানিতে পাই নাই। ধনের সঙ্কীর্ণতা ভেদ করিয়া মনুষ্যসাধারণের অকুণ্ঠিত সংস্রবলাভ যাঁহার প্রসাদে আমাদের ঘটিয়াছে, তাঁহাকে আজ আমরা নমস্কার করি।

তিনি আমাদিগকে যে কি পরিমাণে স্বাধীনতা দিয়াছেন, তাহা আমরা ছাড়া আর কে জানিবে! যে ধর্ম্মকে তিনি ব্যাকুল সন্ধানের দ্বারা পাইয়াছেন, যে ধর্ম্মকে তিনি উৎকট বিপদের মধ্যেও রক্ষা করিয়াছেন, যে ধর্ম্মের উদ্দেশে তিনি তাঁহার সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, সেই ধর্ম্মকে তিনি আপনার গৃহের মধ্যেও শাসনের বস্তু করেন নাই। তাঁহার দৃষ্টান্ত আমাদের সম্মুখে ছিল, তাঁহার উপদেশ হইতে আমরা বঞ্চিত হই নাই, কিন্তু কোনো নিয়মের শাসনে তিনি আমাদের বুদ্ধিকে, আমাদের কর্ম্মকে বদ্ধ করেন নাই। তিনি কোনো বিশেষ মতকে অভ্যাস বা অনুশাসনের দ্বারা আমাদের উপরে স্থাপন করিতে চান নাই —ঈশ্বরকে, ধর্ম্মকে স্বাধীনভাবে সন্ধান করিবার পথ তিনি আমাদের সম্মুখে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। এই স্বাধীনতার দ্বারা তিনি আমাদিগকে পরম সম্মানিত করিয়াছেন—তাঁহার প্রদত্ত সেই সম্মানের যোগ্য হইয়া,

সত্য হইতে যেন স্খলিত না হই, ধর্ম্ম হইতে যেন স্খলিত না হই, কুশল হইতে যেন স্খলিত না হই! পৃথিবীতে কোনো পরিবার কখনই চিরদিন একভাবে থাকিতে পাবে না, —ধন ও খ্যাতিকে কোনো বংশ চিরদিন আপনার মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না—ইন্দ্রধনুর বিচিত্র বর্ণচ্ছটার ন্যায় এই গৃহের সমৃদ্ধি নিশ্চয়ই একদিন দিগন্তরালে বিলীন হইয়া যাইবে, ক্রমে নানা ছিদ্রযোগে বিচ্ছেদবিশ্লেষের বীজ প্রবেশ করিয়া কোন্ একদিন এই পবিবারের ভিত্তিকে শতধা বিদীর্ণ করিয়া দিবে—কিন্তু এই পরিবাবের মধ্য দিয়া যিনি অচেতন সমাজকে ধর্ম্মজিজ্ঞাসায় সজীব কবিয়া দিয়াছেন, যিনি নূতন ইংবাজিশিক্ষার ঔদ্ধত্যের দিনে শিশু বঙ্গভাষাকে বহুযত্নে কৈশোরে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছেন, যিনি দেশকে তাহার প্রাচীন ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার উদ্ঘাটিত কবিতে প্রবৃত্ত করিয়াছেন, যিনি তাঁহার তপঃপরায়ণ একলক্ষ্য জীবনের দ্বারা আধুনিক বিষয়লুব্ধ সমাজে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের আদর্শ পুনঃস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন, তিনি এই পরিবারকে সমস্ত মনুষ্যপবিবারেব সহিত সংযুক্ত করিয়া-দিয়া, ইহার সর্ব্বোচ্চ লাভকে সমস্ত মনুষ্যের লাভ করিয়া-দিয়া, ইহার পরম ক্ষতিকে সমস্ত মনুষ্যের ক্ষতি করিয়া-দিয়া আমাদিগকে যে গৌরব দান করিয়াছেন, অদ্য সমস্ত ক্ষুদ্র মানমর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়া অদ্য আমরা তাহাই স্মরণ কবিব ও একান্ত ভক্তির সহিত তাঁহার নিকটে আপনাকে প্রণত করিয়া দিব ও যাঁহাব মধ্যে তিনি আশ্রয়লাভ করিয়াছেন, সমস্ত ধন-মানের উর্দ্ধে, খ্যাতিপ্রতিপত্তির উর্দ্ধে তাঁহাকেই দর্শন কবিব।

হে বিশ্ববিধাতঃ, আজ আমাদেব সমস্ত বিষাদ-অবসাদ দূর করিয়া দাও—মৃত্যু সহসা যে যবনিকা অপসারণ করিয়াছে, তাহার মধ্য দিয়া তোমার অমৃতলোকের আভাস আমাদিগকে দেখিতে দাও! সংসারের নিয়ত উত্থানপতন, ধনমানজীবনের আবির্ভাবতিরোভাবের মধ্যে তোমার "আনন্দরূপমমৃতং" প্রকাশ কর। কত বৃহৎ সাম্রাজ্য ধূলিসাৎ হইতেছে,

কত প্রবল প্রতাপ অস্তমিত হইতেছে, কত লোকবিশ্রুত খ্যাতি বিস্মৃতি-মগ্ন হইতেছে, কত কুবেরের ভাণ্ডার ভগ্নস্তূপের বিভীষিকা রাখিয়া অন্তর্হিত হইতেছে—কিন্তু হে আনন্দময়, এই সমস্ত পরিবর্ত্তনপরম্পরার মধ্যে "মধু বাতা ঋতায়তে" বায়ু মধুবহন করিতেছে, "মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ" সমুদ্রসকল মধুক্ষরণ করিতেছে—তোমার অনন্ত মাধুর্য্যের কোনো ক্ষয় নাই—তোমার সেই বিশ্বব্যাপিনী মাধুরী সমস্ত শোকতাপবিক্ষোভের কুহেলিকা ভেদ করিয়া অদ্য আমাদের চিত্তকে অধিকার করুক্!

মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ, মধু নক্তম্ উতোষসঃ, মধুমৎ পার্থিবং রজঃ, মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা, মধুমান্নো বনস্পতিঃ, মধুমান্ অস্তু সূর্য্যঃ, মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ।

ওষধিরা আমাদের পক্ষে মাধ্বী হউক্, রাত্রি এবং উষা আমাদের পক্ষে মধু হউক্, পৃথিবীর ধূলি আমাদের পক্ষে মধুমান্ হউক্, এই যে আকাশ পিতার ন্যায় সমস্ত জগৎকে ধারণ করিয়া আছে, ইহা আমাদের পক্ষে মধু হউক্, সূর্য্য মধুমান্ হউক্ এবং গাভীরা আমাদের জন্য মাধ্বী হউক্!

১৩১১

মহাপুরুষ।*

জগতে যে সকল মহাপুরুষ ধর্ম্মসমাজ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা যাহা দিতে চাহিয়াছেন, তাহা আমরা নিতে পারি নাই, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। শুধু পারি নাই যে, তাহা নয়, আমরা এক লইতে হয় ত আর লইয়া বসিয়াছি। ধর্ম্মের আসনে সাম্প্রদায়িকতাকে বরণ করিয়া হয় ত নিজেকে সার্থক জ্ঞান করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আছি।

তাহার একটা কারণ, আমাদের গ্রহণ করিবার শক্তি সকলের এক-

* মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের শ্রাদ্ধসভায় পঠিত।

রকমের নয়। আমার মন যে পথে সহজে চলে, অন্যের মন সে পথে বাধা পায়। আমাদের এই মানসিক বৈচিত্র্যকে অস্বীকার করিয়া সকল মানুষের জন্যই একই বাঁধা রাজপথ বানাইয়া দিবার চেষ্টা আমাদের মনে আসে। কারণ, তাহাতে কাজ সহজ হইয়া যায়। সে চেষ্টা এ পর্য্যন্ত সফল হয় নাই। সফল হওয়া যে অসাধ্য, তাহাও আমরা ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। সেইজন্য যে পথে আমি চলিয়া অভ্যস্ত বা আমার পক্ষে যাহা সহজ, সেই পথই যে সকলের একমাত্র পথ নয়, কাহারো পক্ষে যে তাহা দুর্গম হইতে পারে, এ কথা আমরা মনেও করিতে পারি না। এইজন্যই, এই পথেই সব মানুষকে টানা আমরা জগতের একমাত্র মঙ্গল বলিয়া মনে করি। এই টানাটানিতে কেহ আপত্তিপ্রকাশ করিলে আমরা আশ্চর্য্যবোধ করি, মনে করি—সে লোকটা, হয়, ইচ্ছা করিয়া নিজের হিত পরিত্যাগ করিতেছে, নয়, তাহার মধ্যে এমন একটা হীনতা আছে, যাহা অবজ্ঞার যোগ্য।

কিন্তু ঈশ্বর আমাদের মনের মধ্যে গতিশক্তির যে বৈচিত্র্য দিয়াছেন, আমরা কোনো কৌশলেই তাহাকে একাকার করিয়া দিতে পারিব না। গতির লক্ষ্য এক, কিন্তু তাহার পথ অনেক। সব নদীই সাগরের দিকে চলিয়াছে, কিন্তু সবাই এক নদী হইয়া চলে নাই। চলে নাই, সে আমাদের ভাগ্য।

ঈশ্বর কোনোমতেই আমাদের সকলকেই একটা বাঁধা-পথে চলিতে দিবেন না। অনায়াসে চোখ বুজিয়া আমরা একজনের পশ্চাতে আর একজন চলিব, ঈশ্বর আমাদের পথকে এত সহজ কোনোদিন করিবেন না। কোনো ব্যক্তি—তাঁহার যত-বড় ক্ষমতাই থাক্, পৃথিবীর সমস্ত মানবাত্মার জন্য নিশ্চেষ্ট জড়ত্বের সুগমতা চিরদিনের জন্য বানাইয়া দিয়া যাইবেন, মানুষের এমন দুর্গতি বিশ্ববিধাতা কখনই সহ্য করিতে পারেন না।

এইজন্য প্রত্যেক মানুষের মনের গভীরতর স্তরে ঈশ্বর একটি স্বাতন্ত্র্য দিয়াছেন; অন্তত সেখানে একজনের উপর আর একজনের কোনো অধিকার নাই। সেখানেই তাহার অমরতার বীজকোষ বড় সাবধানে রক্ষিত; সেইখানেই তাহাকে নিজের শক্তিতে নিজে সার্থক হইতে হইবে। সহজের প্রলোভনে এই জায়গাটার দখল যে ব্যক্তি ছাড়িয়া দিতে চায়, সে লাভে-মূলে সমস্তই হারায়। সেই ব্যক্তিই ধর্ম্মের বদলে সম্প্রদায়কে, ঈশ্বরের বদলে গুরুকে, বোধের বদলে গ্রন্থকে লইয়া চোখ বুজিয়া বসিয়া থাকে। শুধু বসিয়া থাকিলেও বাঁচিতাম, দল বাড়াইবার চেষ্টায় পৃথিবীতে অনেক ব্যর্থতা এবং অনেক বিরোধের সৃষ্টি করে।

এইজন্য বলিতেছিলাম, মহাপুরুষেরা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া যান, আর আমরা তাহার মধ্য হইতে সম্প্রদায়টাই লই, ধর্ম্মটা লই না। কারণ, বিধাতার বিধানে ধর্ম্মজিনিষটাকে নিজের স্বাধীনশক্তির দ্বারাই পাইতে হয়, অন্যের কাছ হইতে তাহা আরামে ভিক্ষা মাগিয়া লইবার জো নাই। কোনো সত্যপদার্থই আমরা আর কাহারো কাছ হইতে কেবল হাত পাতিয়া চাহিয়া পাইতে পারি না। যেখানে সহজ রাস্তা ধরিয়া ভিক্ষা করিতে গিয়াছি, সেখানেই ফাঁকিতে পড়িয়াছি। তেমন করিয়া যাহা পাইয়াছি, তাহাতে আত্মার পেট ভরে নাই, কিন্তু আত্মার জাত্ গিয়াছে।

তবে ধর্ম্মসম্প্রদায়ব্যাপারটাকে আমরা কি চোখে দেখিব? তাহাকে এই বলিয়াই জানিতে হইবে যে, তাহা তৃষ্ণা মিটাইবার জল নহে, তাহা জল খাইবার পাত্র। সত্যকার তৃষ্ণা যাহার আছে, সে জলের জন্যই ব্যাকুল হইয়া ফিরে, সে উপযুক্ত সুযোগ পাইলে গণ্ডূষে করিয়াই পিপাসা-নিবৃত্তি করে। কিন্তু যাহার পিপাসা নাই, সে পাত্রটাকেই সব চেয়ে দামী বলিয়া জানে। সেইজন্যই জল কোথায় পড়িয়া থাকে, তাহার ঠিক নাই, পাত্র লইয়াই পৃথিবীতে বিষম মারামারি বাধিয়া যায়। তখন যে

ধর্ম্ম বিষয়বুদ্ধির ফাঁস আল্‌গা করিবে বলিয়া আসিয়াছিল, তাহা জগতে একটা নূতনতর বৈষয়িকতার সূক্ষ্মতর জাল সৃষ্টি করিয়া বসে, সে জাল কাটানো শক্ত।

ধর্ম্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতারা নিজের নিজের সাধ্যানুসারে আমাদের জন্য, মাটির হোক্ আর সোনার হোক্, একএকটা পাত্র গড়িয়া দিয়া যান। আমরা যদি মনে করি, সেই পাত্রটা গড়িয়া-দিয়া যাওয়াই তাঁহাদের মাহাত্ম্যের সব চেয়ে বড় পরিচয়, তবে সেটা আমাদের ভুল হইবে। কারণ, পাত্রটি আমাদের কাছে যতই প্রিয় এবং যতই সুবিধাকর হউক্, তাহা কখনই পৃথিবীর সকলেরই কাছে সমান প্রিয় এবং সমান সুবিধাকর হইতে পারে না। ভক্তির মোহে অন্ধ হইয়া, দলের গর্ব্বে মত্ত হইয়া, এ কথা ভুলিলে চলিবে না। কথামালার গল্প সকলেই জানেন—শৃগাল থালায় ঝোল রাখিয়া সারসকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, লম্বা ঠোঁট্ লইয়া সারস তাহা খাইতে পারে নাই। তার পর সারস যখন সরুমুখ চোঙের মধ্যে ঝোল রাখিয়া শৃগালকে ফিরিয়া নিমন্ত্রণ করিল, তখন শৃগালকে ক্ষুধা লইয়াই ফিরিতে হইয়াছিল। সেইরূপ এমন সর্ব্বজনীন ধর্ম্মসমাজ আমরা কল্পনা করিতে পারি না, যাহা তাহার মত ও অনুষ্ঠান লইয়া সকলেরই বুদ্ধি, রুচি ও প্রয়োজনকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে।

অতএব শাস্ত্রীয় ধর্ম্মমত ও আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মসমাজ স্থাপনের দিক্ হইতে পৃথিবীর ধর্ম্মগুরুদিগকে দেখা তাঁহাদিগকে ছোট করিয়া দেখা। তেমন করিয়া কেবল দলের লোকেরাই দেখিতে পারে এবং তাহাতে করিয়া কেবল দলাদলিকেই বাড়াইয়া তোলা হয়। তাঁহাদের মধ্যে নিশ্চয়ই এমন একটি দেখিবার আছে, যাহা লইয়া সকল দেশে সকল কালে সকল মানুষকেই আহ্বান করা যায়। যাহা প্রদীপপাত্র নহে, যাহা আলো।

সেটি কি? না, যেটি তাঁহারা নিজেরা পাইয়াছেন। যাহা গড়িয়াছেন,

তাহা নহে। যাহা পাইয়াছেন, সে ত তাঁহাদের নিজের সৃষ্টি নহে, যাহা গড়িয়াছেন, তাহা তাঁহাদের নিজের রচনা।

আজ যাঁহার স্মরণার্থ আমরা সকলে এখানে সমবেত হইয়াছি, তাঁহাকেও যাহাতে কোনো-একটা দলের দিক্ হইতে না দেখি, ইহাই আমার নিবেদন। সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা সম্প্রদায়ের ধ্বজাকেই সর্ব্বোচ্চ করিয়া ধরিতে গিয়া পাছে গুরুকেও তাহার কাছে খর্ব্ব করিয়া দেন, এ আশঙ্কা মন হইতে কিছুতেই দূর হয় না—অন্তত আজিকার দিনে নিজেদের সেই সঙ্কীর্ণতা তাঁহার প্রতি যেন আরোপ না করি।

অবশ্যই, কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহার প্রকৃতির বিশেষত্ব নানারূপে দেখা দিয়াছে। তাঁহার ভাষায়, তাঁহার ব্যবহারে, তাঁহার কর্ম্মে তিনি বিশেষভাবে নিজেকে আমাদের কাছে প্রকাশ করিয়াছেন—তাঁহার সেই স্বাভাবিক বিশেষত্ব জীবনচরিত-আলোচনা-কালে উপাদেয়, সন্দেহ নাই। সেই আলোচনায় তাঁহার সংস্কার, তাঁহার শিক্ষা, তাঁহার প্রতি তাঁহার দেশের ও কালের প্রভাবসম্বন্ধীয় সমস্ত তথ্য আমাদের কৌতূহলনিবৃত্তি করে। কিন্তু সেই সমস্ত বিশেষভাবকে আচ্ছন্ন করিয়া-দিয়া তাঁহার জীবন কি আর কাহাকেও আমাদের কাছে প্রকাশ করিতেছে না? আলো কি প্রদীপকে প্রকাশ করিবার জন্য, না প্রদীপ আলোকে প্রচার করিবার জন্য? তিনি যাঁহাকে দেখিতেছেন ও দেখাইতেছেন, যদি আজ সেইদিকেই আমাদের সমস্ত দৃষ্টি না যায়, আজ যদি তাঁহার নিজের বিশেষত্বের দিকে আমাদের দৃষ্টি কোনো অংশে ঠেকিয়া যায়, তবে গুরুর অবমাননা হইবে।

মহর্ষি একদিন পরিপূর্ণ-ভোগের মাঝখানে জাগিয়া-উঠিয়া বিলাস-মন্দিরের সমস্ত আলোকে অন্ধকার দেখিয়াছিলেন। সেইদিন তিনি তৃষার্ত্তচিত্ত লইয়া পিপাসা মিটাইবার জন্য দুর্গমপথে যাত্রা করিয়াছিলেন, সে কথা সকলেই জানেন। যেখান হইতে অমৃত-উৎস নিঃসৃত হইয়া

সমস্ত জগৎকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে, সেই তীর্থস্থানে তিনি না গিয়া ছাড়েন নাই। সেই তীর্থের জল তিনি আমাদের জন্যও পাত্রে ভরিয়া আনিয়াছিলেন। এ পাত্র আজ-বাদে-কাল ভাঙিয়া যাইতেও পারে, তিনি যে ধর্ম্মসমাজ দাঁড় করাইয়াছেন, তাহার বর্ত্তমান আকৃতি স্থায়ী না হইতেও পারে; কিন্তু তিনি সেই যে অমৃত-উৎসের ধারে গিয়া নিজের জীবনকে ভরিয়া লইয়াছেন, ইহাই আমাদের প্রত্যেকের লাভ। এই লাভ নষ্ট হইবে না, শেষ হইবে না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঈশ্বরকে আর কাহারো হাত দিয়া আমরা পাইব না। তাঁহার কাছে নিজে যাইতে হইবে, তাঁহাকে নিজে পাইতে হইবে। দুঃসাধ্য হয় সেও ভাল, বিলম্ব হয় তাহাতে ক্ষতি নাই। অন্যের মুখে শুনিয়া, উপদেশ পাইয়া, সমাজবিহিত অনুষ্ঠান পালন করিয়া আমরা মনে করি, যেন আমরা চরিতার্থতা লাভ করিলাম, কিন্তু সে ত ঘটির জল, সে ত উৎস নহে। তাহা মলিন হয়, তাহা ফুরাইয়া যায়, তাহাতে আমাদের সমস্ত জীবন অভিষিক্ত হয় না এবং তাহা লইয়া আমরা বিষয়িলোকের মতই অহঙ্কার ও দলাদলি করিতে থাকি। এমন ঘটির জলে আমাদের চলিবে না—সেই উৎসের কাছে আমাদের প্রত্যেককেই যাইতে হইবে—ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের নিজের একান্ত সম্বন্ধ তাঁহার সম্মুখে গিয়া আমাদিগকে নিজে স্বীকার করিতে হইবে। সম্রাট্ যখন আমাকে দরবারে ডাকেন, তখন প্রতিনিধি পাঠাইয়া কি কাজ সারিতে পারি? ঈশ্বর যে আমাদের প্রত্যেককে ডাক দিয়াছেন, সেই ডাকে সাড়া দিয়া একেবারে সম্পূর্ণভাবে তাঁহার কাছে আত্মসমর্পণ করিতে না পারিলে কোনোমতেই আমাদের সার্থকতা নাই!

মহাপুরুষদের জীবন হইতে এই কথাটাই আমরা জানিতে পারি। যখন দেখি, তাঁহারা হঠাৎ সকল কাজ ফেলিয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়াছেন, তখন বুঝিতে পারি, তবে ত আহ্বান আসিতেছে,—আমরা শুনিতে পাই

নাই, কিন্তু তাঁহারা শুনিতে পাইয়াছেন। তখন চারিদিকের কোলাহল হইতে ক্ষণকালের জন্য মনটাকে টানিয়া লই, আমরাও কান পাতিয়া দাঁড়াই। অতএব মহাপুরুষদের জীবন হইতে আমরা প্রথমে স্পষ্ট জানিতে পারি, আত্মার প্রতি পরমাত্মার আহ্বান কতখানি সত্য। এই জানিতে পারাটাই লাভ।

তার পরে আর একদিন তাঁহাদিগকে দেখিতে পাই, সুখে-দুঃখে তাঁহারা শান্ত, প্রলোভনে তাঁহারা অবিচলিত, মঙ্গলব্রতে তাঁহারা দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ। দেখিতে পাই, তাঁহাদের মাথার উপর দিয়া কত ঝড় চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু তাঁহাদের হাল ঠিক আছে; সর্ব্বস্বক্ষতির সম্ভাবনা তাঁহাদের সম্মুখে বিভীষিকারূপে আবির্ভূত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহারা অনায়াসেই তাহাকে স্বীকার করিয়া ন্যায়পথে ধ্রুব হইয়া আছেন; আত্মীয়বন্ধুগণ তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতেছে, কিন্তু তাঁহারা প্রসন্ন-চিত্তে সে সকল বিচ্ছেদ বহন করিতেছেন; তখনই আমরা বুঝিতে পারি, আমরা কি পাই নাই, আর তাঁহারা কি পাইয়াছেন। সে কোন্ শান্তি, কোন্ বন্ধু, কোন্ সম্পদ্! তখন বুঝিতে পারি, আমাদিগকেও নিতান্তই কি পাওয়া চাই, কোন্ লাভে আমাদের সকল অন্বেষণ শান্ত হইয়া যাইবে।

অতএব মহাপুরুষদের জীবনে আমরা প্রথমে দেখি, তাঁহারা কোন্ আকর্ষণে সমস্ত ত্যাগ করিয়া চলিয়াছেন; তাহার পরে দেখিতে পাই, কোন্ লাভে তাঁহাদের সমস্ত ত্যাগ সার্থক হইয়াছে! এইদিকে আমাদের মনের জাগরণটাই আমাদের লাভ। কারণ, এই জাগরণের অভাবেই কোনো লাভই সম্পন্ন হইতে পারে না।

তার পরে যদি ভাবিয়া দেখি, পাইবার ধন কোথায় পাওয়া যাইবে, কেমন করিয়া পাইব, তবে এই প্রশ্নই করিতে হইবে, তাঁহারা কোথায় গিয়াছেন, কেমন করিয়া পাইয়াছেন!

মহর্ষির জীবনে এই প্রশ্নের কি উত্তর পাই? দেখিতে পাই, তিনি তাঁহার পূর্ব্বতন সমস্ত সংস্কার, সমস্ত আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া একেবারে রিক্তহস্তে বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। সমাজের প্রচলিত প্রথা তাঁহাকে ধরিয়া রাখে নাই, শাস্ত্র তাঁহাকে আশ্রয় দেয় নাই। তাঁহার ব্যাকুলতাই তাঁহাকে পথ দেখাইয়া চলিয়াছে। সে পথ তাঁহার নিজেরই প্রকৃতির গভীর গোপন-পথ। সব পথ ছাড়িয়া সেই পথ তাঁহাকে নিজে আবিষ্কার করিয়া লইতে হইয়াছে। এ আবিষ্কার করিবার ধৈর্য্য ও সাহস তাঁহার থাকিত না, তিনিও পাঁচজনের পথে চলিয়া, ধর্ম্ম না হউক্, ধার্ম্মিকতা লাভ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন। কিন্তু তাঁহার পক্ষে যে না পাইলে নয় হইয়া উঠিয়াছিল, সেইজন্য তাঁহাকে নিজের পথ নিজেকে বাহির করিতে হইয়াছিল। সেজন্য তাঁহাকে যত দুঃখ, যত তিরস্কার হউক্, সমস্ত স্বীকার করিতে হইয়াছিল—ইহা বাঁচাইবার জো নাই। ঈশ্বর যে তাহাই চান। তিনি বিশ্বের ঈশ্বর হইয়াও আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে একটি নিতান্ত একমাত্র স্বতন্ত্র সম্বন্ধে ধরা দিবেন—সেইজন্য আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে তিনি একটি দুর্ভেদ্য স্বাতন্ত্র্যকে চারিদিকের আক্রমণ হইতে নিয়ত রক্ষা করিয়াছেন—এই অতি নির্ম্মল নির্জ্জন-নিভৃত স্বাতন্ত্র্যের মধ্যেই তাঁহার সঙ্গে আমাদের মিলনের স্থান নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। সেইখানকার দ্বার যখন আমরা নিজের চেষ্টায় খুলিয়া তাঁহার কাছে আমাদের সেই চরম স্বাতন্ত্র্যের অধিকার একেবারে ছাড়িয়া দিব, বিশ্বের মধ্যে যাহা আমি ছাড়া আর কাহারো নহে, সেইটেই যখন তাঁহার কাছে সমর্পণ করিতে পারিব, তখনই আর আমার কিছু বাকি থাকিবে না, তখনই তাঁহাকে পাওয়া হইবে। এই যে আমাদের স্বাতন্ত্র্যের দ্বার, ইহার প্রত্যেকের চাবি স্বতন্ত্র; একজনের চাবি দিয়া আর একজনের দ্বার খুলিবে না। পৃথিবীতে যাঁহারা ঈশ্বরকে না পাওয়া পর্য্যন্ত থামেন নাই, তাঁহারা সকলেই ব্যাকুলতার নির্দ্দেশ মানিয়া নিজের চাবি নিজে যেমন করিয়া

পারেন সন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছেন। কেবল পরের প্রতি নির্ভর করিয়া আলস্যবশত এ যাঁহারা না করিয়াছেন, তাঁহারা কোনো-একটা ধর্ম্মমত, ধর্ম্মগ্রন্থ বা ধর্ম্মসম্প্রদায়ে আসিয়া ঠেকিয়াছেন ও সেইখানেই তরঙ্গিত হইয়া উঠিয়া কলরব করিতেছেন, শেষ পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছেন নাই।

আমাদের শক্তি যদি ক্ষীণ হয়, আমাদের আকাঙ্ক্ষা যদি সত্য না হয়, তবে আমরা শেষ পর্য্যন্ত কবে গিয়া পৌঁছিব, জানি না—কিন্তু মহাপুরুষদের জীবন যেদিন আলোচনা করিতে বসিব, সেদিন যেন সেই শেষলক্ষ্যের কথাটাই সম্মুখে রাখি—তাঁহাদের স্মৃতি যেন আমাদিগকে পারের ঘাটের আলো দেখায়—তাহাকে যেন আমরা কোনোদিন সাম্প্রদায়িক অভিযানের মশাল করিয়া না তুলি। তাঁহাদের দৃষ্টান্ত আমাদিগকে বন্ধন হইতে উদ্ধার করিয়া দিবে, পরবশতা হইতে উত্তীর্ণ করিয়া দিবে, আমাদিগকে নিজের সত্যশক্তিতে, সত্যচেষ্টায়, সত্যপথে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবে; আমাদিগকে ভিক্ষা দিবে না, সন্ধান দিবে; আশ্রয় দিবে না, অভয় দিবে; অনুসরণ করিতে বলিবে না, অগ্রসর হইতে উৎসাহিত করিবে। এক কথায়, মহাপুরুষ তাঁহার নিজের রচনার দিকে আমাদিগকে টানিতেছেন না, ঈশ্বরের দিকে আহ্বান করিতেছেন। আজ আমরা যেন মনকে স্তব্ধ করি, শান্ত করি;—যাহা প্রতিদিন ভাঙিতেছে-গড়িতেছে, যাহা লইয়া তর্কবিতর্ক-বিরোধবিদ্বেষের অন্ত নাই, যেখানে মানুষের বুদ্ধির, রুচির, অভ্যাসের অনৈক্য, সে সমস্তকেই মৃত্যুর সম্মুখে যেন আজ ক্ষুদ্র করিয়া দেখিতে পারি; কেবল আমাদের আত্মার যে শক্তিকে ঈশ্বর আমাদের জীবনমৃত্যুর নিত্যসম্বলরূপে আমাদিগকে দান করিয়াছেন, তাঁহার যে বাণী আমাদের সুখে-দুঃখে, উত্থানে-পতনে, জয়ে-পরাজয়ে চিরদিন আমাদের অন্তরাত্মায় ধ্বনিত হইতেছে, তাঁহার যে সম্বন্ধ নিগূঢ়রূপে, নিত্যরূপে, একান্তরূপে আমারই, তাহাই আজ

নির্ম্মলচিত্তে উপলব্ধি করিব; মহাপুরুষের সমস্ত সাধনা যাঁহাতে সার্থক হইয়াছে, সমাপ্ত হইয়াছে; সমস্ত কর্ম্মের খণ্ডতা, সমস্ত চেষ্টার ভঙ্গুরতা, সমস্ত প্রকাশের অসম্পূর্ণতা যে এক পরম পরিণামের মধ্যে পরিপূর্ণ হইয়াছে, সেই দিকেই আজ আমাদের শান্তদৃষ্টিকে স্থির রাখিব। সম্প্রদায়ের লোকদিগকে এই কথা বিশেষভাবে স্মরণ করাইয়া-দিয়া আমরা সেই পরলোকগত মহাত্মার নিকট আমাদের বিনম্রহৃদয়ের শ্রদ্ধা নিবেদন করি, তাঁহার স্মৃতিশিখরের ঊর্দ্ধে করজোড়ে সেই ধ্রুবতারার মহিমা নিরীক্ষণ করি—যে শাশ্বতজ্যোতি সম্পদ্‌বিপদের দুর্গম সমুদ্রপথের মধ্য দিয়া দীর্ঘদিনের অবসানে তাঁহার জীবনকে তাহার চরম বিশ্রামের তীর্থে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে।

১৩১৩